ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana™ SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ২১ সংখ্যা ।। ১২ মাঘ, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১০) ২৬ জানুয়ারি, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com ।। প্রজাতন্ত্র সংখ্যা।।

প্রজাতন্ত্রের ৬০ বছরেও

জাতীয় প্রতীকের অপব্যবহার

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সম্প্রতি এক জনস্বার্থ মামলায় (পি আই এল) কেন্দ্র এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জাতীয় প্রতীক অশোক স্তম্ভ ব্যবহারের নীতি স্পষ্ট করতে নির্দেশ জারি করেছে কলকাতা উচ্চ আদালত। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন অফিসে জাতীয় প্রতীক অশোকস্তম্ভ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না বলে জনৈক কমল দে কলকাতা হাইকোর্টে অভিযোগ দায়ের করেছেন। প্রজাতন্ত্রের উনষাট বছর পরেও এবার জাতীয় পতাকা অবমাননার মতো জাতীয় প্রতীক-এর অপব্যবহারের অভিযোগ ওঠায় বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে আবেদনকারী উদাহরণ বা প্রমাণ হিসেবে অনেক ছবিও দাখিল করেছেন। শ্রী দে তাঁর পিটিশনে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন — পশ্চিমবঙ্গে 'বিকাশ ভবন', ন্যাশনাল লাইব্রেরি, ইন্ডিয়ান কাস্টমস্ হাউস কলকাতা, ফরেন পোস্ট ডায়রেক্টর-এর অফিস, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শাসকের কার্যালয়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট-এর অফিস, গড়িয়াহাট থানা এবং হাওড়া জেলা কালেক্টরেট-এর অফিসে এই শ্লোকবিহীন জাতীয় প্রতীক ব্যবহারের ঘটনা ঘটেছে। প্রজাতন্ত্রের ষাট তম বছরেও জাতীয় প্রতীক অপব্যবহারের অভিযোগ ওঠায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এস এস নিজ্জর এবং বিচারপতি বিশ্বনাথ সমাদ্দারের ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্র ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে তিন সপ্তাহের মধ্যেই হলফনামা পেশ করতে বলেছেন। আবেদনকারীর উকিল রজত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য হল, বিভিন্ন প্রতীকী ছবি — তিনটি সিংহের মাথা, ধর্মচক্র প্রভৃতি ঠিকঠাক থাকলেও অনেক সরকারি অফিসেই প্রতীকের নীচের অংশে 'সত্যমেব জয়তে' কথাটিই নেই। মাণ্ডুক্য উপনিষদের এই শ্লোকাংশটি জাতীয় প্রতীক-এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

পিটিশনকারী কমল দে আবেদনে বলেছেন, এসব ক্ষেত্রে কর্তব্যে অবহেলা, জাতীয় প্রতীক সঠিকভাবে ব্যবহার না করার ফলে নাম এবং প্রতীক ব্যবহার সংক্রান্ত আইন ১৯৫০ চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। এছাড়া জাতীয় প্রতীকের ভুল ব্যবহার নিরোধক আইন ২০০৫ এবং জাতীয় প্রতীক অবমাননা প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭-ও লঙ্ঘন করা হয়েছে। একই সঙ্গে সংবিধানের ৫১-এ ধারায় মৌলিক কর্তব্য সম্পর্কে যা বলা আছে তাও ভঙ্গ করা হয়েছে। সরকারি উকিল এই সব অভিযোগ সম্বলিত রিট পিটিশনকে উড়িয়ে দিতে চাইলেও আদালত তা সমর্থন করেনি। উল্টে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

সন্ত্রাস রুখতে উপকূল রক্ষার টাকাও খরচ করেনি সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ১৯৯৩ থেকে ২০০৮-এর ২৬।১১ পর্যন্ত (মুম্বাই) সন্ত্রাসবাদীদের ধারাবাহিক আক্রমণ ঘটে চললেও কী কেন্দ্র কী রাজ্য — কোনও সরকারেরই তেমন তৎপরতা দেখা যায়নি। শুধু তাই নয়, সন্ত্রাস দমনে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, সেগুলিও কার্যকর করা হয়নি। ২০০৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে উপকূলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও দৃঢ় এবং তৎপর করতে বরাদ্দ হয়েছিল ৫৫১ কোটি টাকা। ২০০৯ সালের মধ্যে ওই টাকা উপকূলরক্ষা খাতে খরচ করার কথা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মাত্র ৮০ কোটি টাকা ওই খাতে খরচ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং রাজ্যগুলো মিলিয়ে ভারতীয় সমুদ্র উপকূলের দৈর্ঘ্য ৭৫০০ কিলোমিটার। বাজেট-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী উপকূল এলাকায় নতুন করে ৭৩টি থানা গড়ার কথা ছিল। তার মধ্যে গুজরাটে ১০টি, মহারাষ্ট্রে ১২টি, গোয়ায় ৩টি, কর্ণাটকে ৫টি, কেরলে ৮টি, তামিলনাড়ুতে ১২টি, অন্ধ্রপ্রদেশে ৬টি, ওড়িশায় ৫টি, পশ্চিমবঙ্গে ৬টি, পণ্ডিচেরীতে ১টি, লাক্ষাদ্বীপে ৪টি এবং দমন-দিউতে একটি থানা তৈরির পরিকল্পনা স্থির হয়েছিল। কার্যত, দেখা গেছে যে, ফাণ্ড-এর অপ্রতুলতার দোহাই দিয়ে এখন রয়েছে মাত্র ৫৫টি থানা। নতুন ৭৩টির মধ্যে ২৩টি-র কাজ সম্পূর্ণ করা গেছে। ১৯টি থানার বাড়ি তৈরির কাজ চলছে। আর বাকী প্রস্তাবিত ৩১টি থানার জন্য কিছুই করা হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, ওড়িশা এবং গোয়ার রাজ্য সরকারকে ২৩ পাতার এক নির্দেশনামা পাঠিয়েছে। ওই নির্দেশে বিশেষভবে চেষ্টা করে শীঘ্রই থানা গঠন করার কাজ সম্পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দিল্লী সম্মেলনেও আলোচনা হয়েছে। আলোচনা হয়েছে রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়েও।

কেন্দ্রীয় বরাদ্দের হিসাব নিকাশ (কোটি টাকায়)

রাজ্যের নাম	অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ	অর্থ কাজে লাগানোর হিসাব
গুজরাট	৫৮.৪২৬০	৮.১৬
মহারাষ্ট্র	৪০.৯২৬০	৪.৬০৮
গোয়া	১৬.৫৩৫০	১.২২৪৫
কর্ণাটক	২৭.১১৯০	২.১১৯
কেরল	৪৩.৫৬	১.২০৬
তামিলনাড়ু	৪৪.০৮	৬.৪৭
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩২.৬৭	২.০৪৯
ওড়িশা	২৭.২২৫০	৮.৩৩৭
পশ্চিমবঙ্গ	৩৩.৫৩৪০	২.০৩৯
পণ্ডিচেরী	৫.৪৪৫০	.৪৪৫০
লাক্ষাদ্বীপ	৯.৩৬৮০	.৬১০০
দমন-দিউ	৬.৬৮৩৫	.৫৮১৫
আন্দামান ও নিকোবার	২৬.০৪	.৭৭৭৮৮
মোট	৩৭১.৬১১৫	৩১.১২৩৫৮
উপকূল রক্ষীদের প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয়		১.০৫০২৮
বোটের জন্য খরচ		৪৮.৭১
সর্বমোট	৩৭১.৬১১৫	৮০.৮৮৩৮৬

বেশ কয়েক বছর যাবৎ ভারতের সমুদ্র উপকূলের অবস্থা উদ্বেগজনক। সমুদ্র পথে উপকূল দিয়ে আসছে জঙ্গি ও অনুপ্রবেশকারীর দল। বিভিন্ন ধরনের বেআইনি কাজকর্মও বেড়ে গেছে। নব্বই-এর দশক থেকেই চাপে রয়েছে উপকূল রক্ষীবাহিনী এবং রাজ্য পুলিশ। ১৯৯৩ সালে মুম্বাই বিস্ফোরণের জন্য গোলাবারুদ, আর ডি এক্স, এ কে ৪৭ সিরিজের রাইফেল সমুদ্রপথেই এসেছিল।

২০০৫-এর জানুয়ারিতে কেন্দ্রের একদল মন্ত্রী জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিষয়ে এক পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষা করে বেশ কিছু সুপারিশ করেন। সেই সুপারিশে ভারতের উপকূল এলাকায় ব্যাপক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছিল। ওই মন্ত্রীরা বিভিন্ন নিরাপত্তা এজেন্সির সঙ্গে মত বিনিময় এবং আলোচনা করেন। তারপরই ২০০৫-০৬ সালে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছিল। এককালীন ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। এছাড়া আরও ১৫১ কোটি টাকা প্রশিক্ষণ, জ্বালানি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং যানবাহনের মেরামত প্রভৃতি কাজে বরাদ্দ করা হয়েছে। সমুদ্র সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির উপকূল এলাকায় ব্যাপক পাহারা ও নজরদারি করার কথাও বলা হয়েছে। একই সঙ্গে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দমন, দিউ, লাক্ষাদ্বীপ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ সহ পণ্ডিচেরির উপকূলেও নজরদারি জোরদার করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

সেজন্যই ৭৩টি উপকূলবর্তী থানা,

(এরপর ৪ পাতায়)

দারুল-উলুমকে দেদার টাকা যোগাচ্ছে কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। এতদিন ছিল খারিজি মাদ্রাসা, এবার দারুল-উলুম এবং মোক্তবের জন্য দেদার অর্থ সাহায্য শুরু করল কেন্দ্রীয় সরকার। মাদ্রাসা খারিজি হলেও তার অন্তত ন্যূনতম পরিকাঠামো বাড়িঘর থাকে। কিন্তু দারুল-উলুম এবং মোক্তবের পাঠ চলে একেবারে মসজিদে। সেখানে কেবলমাত্র কোরাণ হাদিস পড়ানো হয়। মূলত মৌলভি তৈরির কারখানা এগুলি। বহুবার বিভিন্ন নিরাপত্তা এজেন্সি উলুম এবং মোক্তবে জঙ্গি তথা দেশবিরোধী কার্যকলাপের হদিসও পেয়েছে। তা সত্ত্বেও ইসলাম ধর্মশিক্ষার আসরেও কোটি কোটি টাকা বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস সরকার। মুসলিম তোষণের এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কি হবে। কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ণ মন্ত্রক সম্প্রতি সমস্ত রাজ্যে এ সম্পর্কিত একটি নতুন প্রকল্প রাজ্যগুলির কাছে পাঠিয়েছে। রাজ্যগুলির কাছ থেকে এই ধরনের ধর্মশিক্ষার আসরের তালিকা চেয়ে পাঠানো হয়েছে। কেন্দ্র দেশজুড়ে প্রায়

৪ হাজার এমন মোক্তব, দারুল উলুমের টাকা দেবে। দেওয়া হবে ১৫ হাজার প্রশিক্ষকের বেতনও। সব মিলিয়ে কয়েকশো কোটি টাকার এই প্রকল্পটি সরকার শুরু করছে ঠিক লোকসভা ভোটের মুখে। যাতে ভোটের আগেই মসজিদে মসজিদে সরকারি টাকা পৌঁছে যায়। সরকারি মসজিদে টাকা দিলেও সরকার এই টাকা খরচের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ সেভাবে রাখছে না। কায়দা করে বলা হচ্ছে, দারুল-উলুম এবং মোক্তবে অঙ্ক,

(এরপর ৪ পাতায়)

ভারত-বিরোধীদের আড়াল করছে মিডিয়া

গূঢ়পুরুষ ।। স্বাধীনতার ৬১ বছর পার করেও ভারত নিরাপদ নয়। ভারতের সার্বভৌমত্ব অখণ্ডতাকে বহিরাগত হানাদাররা বহুবার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। প্রাচীন ভারতে শক হুন পাঠান মোগল দল সনাতন হিন্দু ভারতকে ভাঙতে চেয়েছে। সফল হয়নি। বৃটিশরাজ ভারতবাসীকে খৃস্টান করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। পারেনি। উল্টে ১৮৫৭ সালে বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে "মহাজাগরণে" এমন শিক্ষা ভারতবাসী দিয়েছিল যে, পাদ্রীরা প্রাণ বাঁচাতে ভারত ছেড়ে পালিয়ে ছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য, সেই মহাজাগরণ ঘটেছিল ধর্মান্তরকরণের প্রতিরোধে। সেই মহাজাগরণকালে মিডিয়া ছিল না। ছিল না দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা। শুধু ছিল এক টুকরো শুকনো রুটি। সেই রুটির টুকরো আর একটু নুন পৌঁছে দিত চরম আত্মত্যাগের বার্তা। দেশমাতার নিমক খেয়েছ। এখন সেই ঋণ শোধ করার পালা। ভারতবাসী বুকের রক্ত দিয়ে মাতৃঋণ শোধ করেছিল।

স্বাধীনতার ছয় দশক পরে ভারত আবার আক্রান্ত। এবং এই প্রথম আক্রমণ এসেছে দেশের ভেতর ও বাইরে থেকে একযোগে। ভেঙে দিতে চাইছে ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। মুছে দিতে চাইছে স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার। প্রয়াত সমাজবাদী জনতা দলের নেতা চন্দ্রশেখর মৃত্যুর আগে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, জয়প্রকাশ নারায়ণ, অটল বিহারী বাজপেয়ীর মতো ব্যক্তিত্বের হাতে গণতন্ত্র রক্ষার ভার থাকতো, তবে এমনভাবে ঘরে বাইরে আক্রান্ত হতে হতো না। চন্দ্রশেখর বলেছিলেন, জরুরি অবস্থার সময়ে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়েছিল। কিন্তু বিপদ এখন তার থেকেও বেশি, জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে ইন্দিরা মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করেছিলেন। সচেতন ভারতবাসী প্রথম সুযোগেই ইন্দিরা এবং তাঁর দলকে ক্ষমতার মসনদ থেকে আবর্জনার পঙ্ককুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। দুর্ভাগ্য, আমরা সেই সচেতনতা হারিয়েছি। গণতন্ত্রের শত্রুদের চিহ্নিত করতে পারছি না। দিনের আলোতেই আমরা রাতকানা।

ভারতের সংবিধান, সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর আঘাত হানছে ঘরভেদি শত্রুরা।

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

নিহত প্রজাতন্ত্রের কাহিনী

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

আমাদের সংবিধানে অত্যন্ত সুচিন্তিত ভাবেই রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে 'সভ্রেন ডেমোক্র্যাটিক রিপাব্লিক' কথাগুলো ঘোষিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, রচয়িতাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু সার্বভৌম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নয়, প্রজাতান্ত্রিক আদর্শকেও রূপায়িত করা। অবশ্যই 'Republic' বা 'প্রজাতন্ত্র' কথাটা নিয়ে একটা বিভ্রান্তি বহুকাল ধরেই ছিল। ডুগুই, জেলিনেক প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এর দ্বারা বুঝিয়েছেন এমন একটা রাষ্ট্রকে যেখানে সর্বসাধারণের হাতেই ক্ষমতা থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হল — তাহলে গণতন্ত্রের সঙ্গে তার পার্থক্য নির্ধারিত হবে কেমন করে — কারণ এতেও তো সাধারণ মানুষের শাসনকে বোঝায়। 'demos'-এর অর্থ জনগণ এবং 'kratia' হল শাসন — 'democracy' বা গণতন্ত্র শব্দগুলো এসেছে এই দুটো গ্রীক কথা থেকে। সুতরাং 'রিপাব্লিক' কথাটার যদি জনগণের শাসনকে বোঝানো হয়, তাহলে বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতির মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকবে না। ডঃ লীবক তাই মন্তব্য করেছেন, সেক্ষেত্রে — 'The British Government is as much republic as Frnace or America' (এলিমেন্টস্ অফ পলিটিক্স, পৃঃ১১৬)।

আরও বলা দরকার, আমাদের প্রাচীন ভারতে বহু রাজ্য রিপাব্লিক নামে পরিচিত ছিল। ডঃ গার্ণারের মতে, প্রাচীন স্পার্টা, এথেন্স, রোমকেও তখন রিপাবলিক বলা হত — (পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাণ্ড গর্ভনমেন্ট, পৃ : ২৯২)।

এই কারণে বর্তমানে গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের মধ্যে একটা পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে। প্রজাতন্ত্র মাত্রই গণতান্ত্রিক, কিন্তু প্রজাতন্ত্রের আরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে তাতে সর্বোচ্চ শাসনকর্তা হয়ে থাকেন নির্বাচিত। গেটেলের ভাষায় — 'The term republic is used to indicate a representative democaracy with an elected head (পলিটিক্যাল সায়েন্স, পৃ : ৯১)। সেই অর্থে বৃটেন গণতন্ত্র, কিন্তু প্রজাতন্ত্র নয়, কারণ সর্বোচ্চ শাসক হলেন রাজা/রাণী — তাঁদের ক্ষমতা আসে উত্তরাধিকার সূত্রে। কিন্তু আমেরিকা প্রজাতন্ত্র — তার উচ্চতম পদাধিকারী রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে জনগণ দ্বারাই নির্বাচিত হন।

আমাদের সংবিধান এই ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছে। ৫৪ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে আমাদের রাষ্ট্রপতিই সর্বোচ্চ শাসক। আর ৫৮ নং অনুচ্ছেদ তাঁর গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছে। তিনি নির্বাচিত হন লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা — তার অর্থ হল তিনি পরোক্ষভাবে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত শাসকপ্রধান।

সুতরাং বলা যায় — প্রজাতন্ত্রের প্রাথমিক শর্তটা সুস্পষ্টভাবেই গৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয় শর্তটা গণতান্ত্রিকতার। সেটাও আইনত মর্যাদা পেয়েছে, কারণ ৩২৬ নং অনুচ্ছেদ গ্রহণ করেছে সার্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি। আঠেরো বছর ও তদূর্দ্ধ বয়স্ক নারী-পুরুষকে নির্দিষ্ট কিছু কারণ ছাড়া ভোটদানের ব্যাপারে বঞ্চিত করা যায় না। আর এই ভোটের মাধ্যমেই সরকার গঠিত হয় এবং তারা জনপ্রতিনিধিদের কাছে দায়িত্বশীল থাকে।

এই দু-দিক থেকে বলা যায় — ভারতীয় সংবিধান প্রজাতন্ত্রের লক্ষ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ন্যূনতম আইনগত ব্যবস্থা অবশ্যই করেছে।

সেই বিচারে ভারত প্রজাতন্ত্র।

তবে দ্বিতীয় বিষয়টা নিয়ে কিছু আলোচনা করা অবশ্যই দরকার।

প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কয়েকটা লক্ষণ রয়েছে — প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ব্যক্তিস্বাধীনতা, সাম্য, সহনশীলতা ও ন্যায়ের আদর্শকেও। তা না হলে ভোটাধিকার ও দায়িত্বশীল সরকার ইত্যাদির কোনও মূল্যই থাকে না।

প্রথমে ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা বলি। সংবিধানের প্রস্তাবনায় (Preamble) গণতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া রয়েছে 'liberty of thought, expression, faith, belief and worship কথাগুলো। আর তৃতীয় অধ্যায়ে আছে 'মৌলিক অধিকার' বা 'fundamental rights'। এতে রয়েছে সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মীয় অধিকার, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার ও সংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার। এগুলো বলবৎযোগ্য (enforceable) অধিকার, কারণ কেউ এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে তিনি সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্টের কাছে প্রতিকার চাইতে পারেন।

এদিক থেকেও প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা ঠিক আছে। কিন্তু বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে এর মূল্য কতটা আছে রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন দিকে।

প্রথম কথা হল — অধিকারগুলোর সঙ্গে এত বেশি বাধা নিষেধ রয়েছে যে, তাদের তাৎপর্যই দারুণভাবে হ্রাস পেয়েছে। এটা ঠিক যে, অধিকার অসীম হতে পারে না, তাদের বৃহত্তর সমাজকল্যাণ ও সমষ্টির স্বার্থের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয় (গোপালন বনাম মাদ্রাজ, ১৯৫০)। কিন্তু বিধি-নিষেধগুলো অত্যন্ত বেশি। আর তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান সংশোধন করেও এই অধিকারগুলোকে ক্ষুণ্ণ বা খর্ব করেছে। এভাবে স্বাধীনতার অধিকারকে কয়েকবার খণ্ডিত করা হয়েছে। সম্পত্তির অধিকারকে পুরোপুরিভাবে বাদই দেওয়া হয়েছে।

এটা নিশ্চয় সংবিধান রচয়িতাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁরাও বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই মৌলিক অধিকারগুলোর রূপরেখা তৈরী করেছিলেন। কিন্তু বারেবারেই এই অধিকারকে সীমিত করা হয়েছে। এই কারণে ডঃ বি সি রাউত মন্তব্য করেছেন, 'The chapter on fundamental rights may be called and apology of the fundamental rights 'limitation on fundamental rights or unfundamental rights' — (ডেমোক্র্যাটিক কন্স্টিটিউশান অফ ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৯৯)।

সাম্যের অধিকার (১৪-১৮ নং অনুচ্ছেদ) সম্বন্ধে এই ধরনের কথা আরও বেশি করে প্রযোজ্য। এতে সামাজিক ও আইনগত সাম্যের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু যেটা আসল, সেই অর্থনৈতিক সাম্যের কোনও ব্যবস্থাই করা হয়নি। অথচ হ্যারল্ড ল্যাস্কি লিখেছেন, অর্থনৈতিক সাম্য ছাড়া প্রকৃত সাম্যই প্রতিষ্ঠিত হয় না। স্বাধীনতার এত বছর পরেও তাই দেখি একদিকে প্রাচুর্য্য আর অন্যদিকে দৈন্য সহ-অবস্থান করছে। একটা হিসেবে দেখা যাচ্ছে ,দেশের সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ মানুষের হাতে সম্পদের সিংহভাগ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে ৫ শতাংশ লোক ৫২ শতাংশ জমির মালিক, আর শহরের ২০ শতাংশ মানুষ ৯৩ শতাংশ জমির অধিকারী। আরও একটা কথা হল — জনসংখ্যার ১০ শতাংশ পেয়ে থাকেন জাতীয় আয়ের এক তৃতীয়াংশ — (ডঃ গৌতমকুমার সরকার — ভারতের পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ও আর্থিক বিকাশ, পৃঃ ৬৫)। এই প্রসঙ্গে ডঃ ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন — প্রায় ২২ কোটি মানুষ ন্যূনতম জীবনমানের নীচে রয়েছেন (ইণ্ডিয়া'জ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান, পৃঃ১০৯)। তাঁরা এই প্রজাতন্ত্রের কেউ না?

এই দুঃসহ আর্থিক বৈষম্যের ফলে সাম্য আদর্শটা অধরাই থেকে গেছে — শিক্ষা, চিকিৎসা, বিলাস ইত্যাদি সবই করায়ত্ত একটা শ্রেণীর — অন্যরা হতাশের নিষ্ফলের দলে।

সাম্যের সামাজিক দিকটার কথাও চিন্তা করা যাক। এক প্রাচীন যুগে আমাদের সমাজে চারটে বর্ণের উদ্ভব হয়েছিল। তারপর সেই বর্ণভেদ আরও প্রসারিত হয়েছে। এখনও রয়েছে ঘৃণা ও বঞ্চনার মানসিকতা।

জাতপাত ভারতের এক বিচিত্র সমস্যা যার নজির পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই — 'Caste is a peculiarly Indian Institution which has no counterpurt elsewhere'—(এস এল সিক্রি — ইণ্ডিয়ান গভর্ণমেন্ট অ্যাণ্ড পলিটিক্স, পৃঃ১৮৫৪)। যুগ যুগ ধরে জাতিভেদের নামে কিছু মানুষকে হেয় করা হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে এক অদ্ভুত ধরনের বৈষম্য। বিশেষ করে, তপশীলী জাতি ও উপজাতিরা অবজ্ঞাত ও বঞ্চিত হয়েছেন।

আর তাঁদের তুলে আনার জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা ভ্রান্ত পথে চলে সমস্যাটাকে সঙ্কটে পরিণত করেছে। সুপ্রীম কোর্ট জাত-পাতের সঙ্গে আর্থিক অবস্থাকেও জড়িয়ে একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিতে বলেছিল (চম্পকম বনাম মাদ্রাজ, ১৯৫১)। কিন্তু পাঁচ দশকের সংরক্ষণের ফলে অনেক তপশিলী পরিবার সমৃদ্ধ হয়েছে, তথাকথিত উচ্চ বর্ণের অনেক দরিদ্র সংসার কিন্তু আরো শ্রীহীন হয়েছে ইতিমধ্যে। তার ফলে ঘটেছে আরেক ধরনের বৈষম্য। আর তপশিলী সমাজেও দেখা দিয়েছে দুই শ্রেণী — সামনে চলে এসেছে একটা 'creamy layer' (জয়শ্রী বনাম কেরালা, এবং কুমার বনাম কর্ণাটক)। বৈষম্য বেড়েছে আরও (জি এস পাণ্ডে কন্স্টিটিউশনাল ল, পৃ : ৯৬)।

সবচেয়ে বড় কথা — সাম্যের কথা ভেবেই সংবিধানের ৪০ নং অনুচ্ছেদ সারা দেশে ('throughout the territory of India) অভিন্ন দেওয়ানী বিধি (civil code) রচনার দায়িত্ব দিয়েছে সরকারকে। সবাইকে ধর্মীয় অধিকার দেওয়া হয়েছে ২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে, সৃষ্টি করা হয়েছে "সেকুলার স্টেট'। কিন্তু আইন হবে একই রকম, এটাই রচয়িতারা চেয়েছিলেন। ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন রকমের হোক, কিন্তু ব্যক্তি ও ব্যক্তি সম্পর্ক, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার ইত্যাদির আইন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একই ধরনের হয়।

কিন্তু এদেশে আজও অভিন্ন দেওয়ানী আইন রচিত হয় নি মুসলিম সমাজের আপত্তির কথা ভেবে। ভোট ব্যাঙ্কে টান পড়ার আশঙ্কায় ষাট দশক পরেও কেউ এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়নি। ওই সমাজের বিধি নাকি 'শরীয়ৎ' করে — রাষ্ট্র নয়। ডঃ হরিহর দাস মন্তব্য করেছেন, 'When the Muslims in Pakistan, Indonesia, Iraq, Egypt and many other Muslims countries have modified and made a liberal interpretation of parsonal law bassed on the shariyat, the vested interests among the Indian Muslims are guided by medievalism — (ইণ্ডিয়া : ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট অ্যাণ্ড পলিটিক্স, পৃ : ৪৩১)। এই মৌলবাদকে অতিক্রম করে ভারতীয় শাসনব্যবস্থা এখনও অভিন্ন দেওয়ানী বিধি তৈরী করার সাহস পায়নি — এটাই আমাদের দুঃখ ও হতাশার একটা বড় কারণ। শাহবানো বনাম আমেদ সামের মামলায় (১৯৮৫) প্রধান বিচারপতি ওয়াই বি চন্দ্রচূড় মন্তব্য করেছিলেন, It is also a matter of regret that art. 44 of our constitution has remained a dead letter. অথচ, তাঁর মতে, এই ধরনের আইন জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্যই দরকার — 'A common civil code will help the cause of national integration। সেই বছরেই ডিয়েঙ্গডে বনাম চোপরার মামলায় শীর্ষ আদালত কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে এই ধরনের আইন প্রনয়ণের জন্যে নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু আজও তা প্রণীত হয়নি। ইতিমধ্যে কিন্তু 'হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট', 'স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট' 'পার্শী ম্যারেজ অ্যাক্ট' ইত্যাদি অন্যান্য

(এরপর ১৫ পাতায়)

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

আমরা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রজারা

আমাদের এই প্রজাতান্ত্রিক দেশে বর্তমানে দুর্নীতি এখন আর লাগামছাড়া নহে, দুর্ভাগ্যের হইলেও সত্য, একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লইয়াছে। যে কেউ যেখানে খুশি তাহা দেখিতে পারে। রাস্তা-ঘাট, অফিস-কাছারি এবং অন্যত্রও। যদি কোনও কাজ করাইবার প্রয়োজন হয় তবে টেবিলের তলা দিয়া কিছু দিতেই হইবে এবং এই ঘুষের হার উপর হইতে নীচ পর্যন্ত নির্দিষ্ট। অবস্থা এমনই পর্যায়ে পৌঁছাইয়াছে যে সাধারণ মানুষও নিজেদের কাজ মিটাইতে এই ঘুষ দিতে দ্বিধা করে না। সরকারি অফিস-আদালতে দেওয়ালে গান্ধীজীর ছবি দেখা যায়। সেখানে তিনি হাত তুলিয়া জনতাকে অভিবাদন করিতেছেন। ছবিটিকে দেখিয়া কেহ কেহ রঙ্গ করিয়া বলেন, নিজের কাজ হাসিলের জন্য গান্ধীজী ৫০০ টাকা দিতে বলিতেছেন। যেখানে আপনি বিচারপ্রার্থী — ন্যায়নীতির শরণাপন্ন হইয়াছেন, সেখানেও ঘুষ দেওয়া-নেওয়ার বিষয়টি খুবই সাধারণ ব্যাপার। সঙ্কোচের কোনও বালাই নাই।

রাম কৈবর্ত থেকে রামলিঙ্গ রাজু, লোভ আর দুর্নীতি যেন ক্রমশই গগনচুম্বী হইয়া উঠিতেছে। রাম কৈবর্তথেকে সত্যম কমপিউটার-এর সি ই ও — গত ষাট বছরে এই চলমান জীবন প্রবাহে আমাদের দেশে একটি বিষয় খুবই প্রকট রূপে দেখা দিয়েছে — তাহা হইল চরিত্রের সংকট। আমাদের সমাজে আজ খুব কমই 'মহাজন' রহিয়াছেন, যাহারা অনুকরণযোগ্য। বকরূপী ধর্মের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে মহাভারতের যুধিষ্ঠির যাঁহাদের অনুসরণে পথ চলিবার কথা বলিয়াছেন, সেই 'মহাজন' বা 'রোল মডেল' আজ খুঁজিয়া পাওয়া ভার। বরং এই ধরনের সৎ মানুষেরা আজ ব্যবস্থার শিকার। আমাদের দেশে সর্বক্ষেত্রে এই পচনের জন্য দায়ী কিছু ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে মূলত রাজনীতির কারবারীরা। আমাদের দেশের প্রাক্তন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তো দুর্নীতিকে 'বিশ্বব্যাপী ঘটনা' বলিয়া কার্যত সমর্থনই করিয়া গিয়াছেন।

সম্প্রতি একটি রাজনৈতিক দলের অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় নেতা গণধর্ষণের পক্ষে ওকালতি পর্যন্ত করিয়াছেন। যে যুবকেরা এক নিরীহ তরুণীর উপর এই পাশবিক অত্যাচার চালাইয়াছিল, তাহারা উচ্চবর্ণের এবং হঠাৎ এই কাজও করে নাই, যথেষ্ট আটঘাট বাঁধিয়াই অগ্রসর হইয়াছিল। ধর্ষণের শিকার তরুণীটি ম্যানেজমেন্ট-এর ছাত্রী সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক হইল, সেখানকার অঞ্চ ল প্রধানের মন্তব্য। তাহার বক্তব্য একট ধর্ষণের ব্যাপার লইয়া এত হৈ-চৈ করিবার কী আছে! দেশের রাজধানী সংশ্লিষ্ট এলাকার মধ্যেই যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে, তবে দেশের নাগরিক জীবনের সামগ্রিক অবস্থা কেমন তাহা সহজেই অনুমেয়। রেপ বা গ্যাং-রেপ কথাটি সংবাদপত্রে এখন আকছার লক্ষ্য করা যায়। এমনকী নিজেদের কুকীর্তি আড়াল করিবার জন্য ভোগ্যা নারীটিকে হত্যা করিতেও দ্বিধা করে না। অথচ এই নরপিশাচদের শাস্তি তেমন হয় না। ধনঞ্জয়-এর মতো দু-একজনের শাস্তি যদিও বা হয়, তাহার পিছনে নীতি বোধ অপেক্ষা রাজনৈতিক লাভালাভের অঙ্কেরই প্রাধান্য থাকে।

অবস্থাটা কোন পর্যায়ে পৌঁছাইয়াছে সম্প্রতি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের কাছে পশ্চি ম চম্পারণের বাগহা গ্রামের কলাবতীর ক্ষোভ উগরে দেওয়া কথাগুলিতেই স্পষ্ট। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে আমলাদের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া কলাবতী জানাইয়াছেন — "আমি এক দুর্ভাগিনী মেয়ের মা। গাঁয়ের এক যুবক বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস করে আমার মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু তার শরীরে মা হওয়ার লক্ষণ ফুটে উঠতেই সেই যুবক জানায়, বিয়ে সে করবে না। অভিযোগ জানাতে পুলিশের কাছে যাই। ছেলের বাড়ির লোক ২০ হাজার টাকার ঘুষ দিয়ে পুলিশের মুখ বন্ধ করে দেয়। দিনের পর দিন পুলিশের বড়কর্তাদের দোরে দোরে ঘুরেছি। কোনও লাভ হয়নি। সবাই শুধু টাকা চায়। এত টাকা কোথায় পাব আমরা? ন্যায় কি শুধু টাকায় মেলে?"

সাংবিধানিক সর্বোচ পদে অধিষ্ঠিত অধিকারীদের সম্পর্কে যদি এমন ভাবনা হয়, তাহা হইলে কি আমরা মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিব? অনুমান করুন, প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে যে জওয়ানরা সেলাম জানাইতেছে, তাহারা যদি নিজেদের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের পরিবারের কোনও অপরাধ বা সরকারি টাকার তছরূপের ঘটনা জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হওয়া সম্ভব? সংসদ ভবন আক্রমণের মূল ষড়যন্ত্রকারীর বিরুদ্ধে আদালতের রায় যদি কার্যকর না হয়, তাহা হইলে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সম্পর্কে আর কতটুকু শ্রদ্ধা অবশিষ্ট থাকিবে? একজন ডি জি পি যদি তাহার বাহিনীর সমীহ বা আস্থা অর্জন করিতে না পারেন তবে অবস্থা কোন পর্যায়ে পৌঁছাইবে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দৌলতে যোগাযোগ ব্যবস্থার আজ এতটাই অগ্রগতি ঘটিয়াছে যে তাহা আর অজানা থাকিছে না, এমনকী সাধারণ মানুষও জানিতে পারিতেছে। এইসব আধিকারিকদের আদেশের উপর তাই কেহ আস্থা রাখিতে পারিতেছেনা।

আমরা, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রজারা, ক্রমেই যেন চরিত্রের সংকটের আবর্তে ডুবিয়া যাইতেছি। আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক নেতারা এখন প্রকাশ্যেই দাগি আসামীদের নিজেদের দলে যোগ দিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছে। কয়েকজন সাংসদ নারী পাচারের দায়ে অভিযুক্ত হইয়াছেন। কয়েকজন ঘুষ লওয়ার সময় হাতে নাতে ধরা পড়িয়াছেন। সাংসদরা সংসদের কক্ষেই ঘুষের টাকার বান্ডিল উজাড় করিয়া দেখাইয়াছেন। এই ধরনের শাসকদের উপর যদি দেশের শাসন ভার থাকে, তাহা হইলে সমাজে যে দুর্নীতির পাঁক জমিয়ে উঠিবে, তাহা খুব স্বাভাবিক। এই অপশাসন দেশকে ধবংসের দিকেই ঠেলিয়া দিবে। দেশের নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি — জাতীয় চরিত্র নির্মাণের নিরন্তর প্রয়াসই এই বিনাশের পথ রুদ্ধ করিতে পারে।

ভারতের প্রজাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনী

মেজর জেনারেল (অবঃ) কে কে গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের প্রজাতন্ত্র ষাট বছরে পড়ল। একটা জাতির জীবনে ষাট বছর একটি পল বা মুহূর্তমাত্র। বিশেষ করে ভারতের মতো একটি দেশ যার ঐতিহ্য সাত হাজার বছরের পুরাতন। ভারত-এর সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে — ভারত 'ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র'। বহু জাতি গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়ের বিবিধতার মাঝে ভারতের এই সাংবিধানিক পরিচয় সমস্ত ভারতবাসীর পক্ষে কল্যাণকারী শাসন এবং সমাজ ব্যবস্থার একটা উদ্দেশ্য তুলে ধরে।

বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র রয়েছে। কোথাও সামরিক স্বৈরচারী, লোক দেখানো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধীশ্বর। কোথাও কোনও পার্টির গণতন্ত্র, কোথাও ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠদের গণতন্ত্র, যেখানে সংখ্যালঘু অথবা জনজাতি গোষ্ঠীর অথবা মহিলাদের কোনও অধিকারই প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রজাতন্ত্রে সমস্ত নাগরিকের সমানাধিকার সাংবিধানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং সেই অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্যে কতগুলি স্তম্ভ আছে। যেমন বিচার বিভাগ, প্রশাসনিক বিভাগ, অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ বিভাগ এবং বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য সামরিক বিভাগ। সর্বশেষ সংযোজন রাষ্ট্রের সংবাদ মাধ্যম। নির্বাচিত সাংসদরা আইনসভায় যে আইনই প্রণয়ন করুন তা যেন সংবিধানের কোনও ধারার পরিপন্থী না হয় এবং তা দেখার দায়িত্ব বিচার বিভাগের।

প্রজাতন্ত্র ঘোষণার সময় থেকেই ভারতের একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব বলতেন, প্রতিরক্ষা খাতে এত অর্থ বরাদ্দ করার কী প্রয়োজন? ভারত অন্য কোনও রাষ্ট্রের ভূখন্ড অধিকার করার অভিলাষী নয়। ভারত শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্র। যদিও স্বাধীনতার প্রথম দিন থেকেই পাকিস্তানী সৈন্যরা কাশ্মীর দখল করার প্রয়াস করেছিল এবং ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে কাশ্মীর বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়তেও হয়েছিল। কিন্তু পর্যায়ক্রমে প্রতিরক্ষা বাজেট কমতে থাকে। প্রথম ধাক্কা ১৯৬২-তে। 'হিন্দি চীনি ভাই ভাই' এবং পঞ্চ শীলের প্রতি আস্থা জানিয়েও চীন অতর্কিতে ভারত আক্রমণ করেছিল। অরুণাচলের বিশাল ভূখণ্ড চীনের অংশ বলে তাদের দাবি। ম্যাকমোহন লাইন তারা মানে না। এত বছরের আলোচনার পরও তারা সেই দাবিতে অনড়। অন্যদিকে আকসাই চীনে ভারতের বিশাল ভূ-খণ্ড তারা অধিকার করে রয়েছে। সেবিষয়ে তারা কথা বলতেই চায় না। গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক সরকার কিছুটা নড়ে চড়ে বসলেন। সাংসদরা বুঝলেন প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে সামারিক বাহিনীকে তৈরি রাখা প্রয়োজন। পদাতিক বাহিনীর ৩০৩ বোল্ট অ্যাকশন রাইফেলের পরিবর্তে এস এল আর রাইফেল এল। এল উন্নত মর্টার, বিমান বাহিনী পেল উন্নত লড়াকু বিমান। নৌ বাহিনীও কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ পেল, পেল সাবমেরিন। ১৯৬৫-তে যখন পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করল, তখন ভারত প্রস্তুতই ছিল। ফলে লাহোর — সিয়ালকোট পর্যন্ত পাঞ্জাবের (পাক) ভূখন্ড এবং হাজিপীর পাস অধিকার করে পাকিস্তানের মুখে থাপ্পড় মারতে সক্ষম হয়েছিল। এরপর এল ১৯৭১-এর বাংলাদেশ যুদ্ধ। ৯৩০০০ পাক সৈন্য বন্দী করে ভারত পাকিস্তানে ফেরৎ পাঠাল এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হল। সম্মুখ সমরে ভারতকে হারানো যাবে না, জম্মু-কাশ্মীরও অধিকার করা যাবে না জেনে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদী পাঠিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে ছায়াযুদ্ধ আরম্ভ করল। সেই প্রক্রিয়া এখনও চলছে। সর্বশেষ মুম্বাই কান্ড। বিগত ষাট বছরের প্রজাতান্ত্রিক ভারতের ইতিহাস এটাই দুঃখবহ কিন্তু বাস্তব। তাদের পরিকল্পনা আগামী ২০২০ খৃস্টাব্দের মধ্যে উত্তর ভারতকে ইসলামিক রাষ্ট্র হিসাবে পরিবর্তিত করা। বাংলাদেশ থেকে সৌদি অর্থের সাহায্যে (মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য শিক্ষাখাতে যা প্রাপ্ত হয়) বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন জেলাগুলিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা বাড়িয়ে বৃহত্তর ইসলামিক বাংলাদেশ সৃষ্টি করা। ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে সীমিত পরিবার সৃষ্টির প্রয়াসে জল ঢেলে দিয়ে মুসলমান-খৃস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ মৌলভী, ইমাম এবং বিশপদের প্ররোচনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির কার্যক্রমে লেগে রয়েছে। ইসলাম ধর্ম এবং রোমান ক্যাথলিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া সমর্থন করে না, এটাই তাদের ধূয়ো। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ভারতবর্ষের এখন এটাই স্বরূপ। প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীকৃষ্ণ আয়ার কেরলে কোনও দম্পতির দুটির বেশি সন্তান হলে ট্যাক্স দিতে হবে এবং মুসলমান সম্প্রদায়ে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব দিচ্ছেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই মুসলমান এবং খৃস্টান সম্প্রদায় প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক ভারতে সকলের মত প্রকাশের অবাধ অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং মানবাধিকার, নিজ নিজ ধর্মীয় নীতি অনুযায়ী জীবন ধারনের স্বাধীনতা, সর্বোপরি অনেকের দৃষ্টিতে দেশের চাইতে ধর্ম বড়। ফলে তসলিমা নাসরিনকে হত্যা অথবা বিতাড়িত করতে বাধা কোথায়? পাকিস্তানী জেহাদীদের আশ্রয়, অর্থ সাহায্য করাতেই বা দোষ কোথায়? বৈরী প্রতিবেশী রাষ্ট্র সেই সুযোগ সম্পূর্ণ ভাবে ব্যবহার করছে।

স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ক্ষমতার অলিন্দে পৌঁছতে নির্বাচনে জয়লাভ একান্তভাবে প্রয়োজন। ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ সেই ভোট ব্যাঙ্ক সর্বস্ব রাজনীতির নির্ণায়ক উপাদান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। ফলে সমস্ত রাজনৈতিক দল ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতিতে ব্যস্ত। রাষ্ট্রের স্বার্থ, ভালমন্দ চুলোয় যাক।

ভারত 'ধর্মনিরপেক্ষ' গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে সকলেই নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সদা সচেতন, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব এবং কর্তব্য তাঁরা কেউই জানেন না। ফলে রাষ্ট্রের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার উপর প্রবল আঘাত আসছে। পুলিশ বাহিনী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে বিফল। পদে পদে সামরিক বাহিনীকে তলব করা হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদী অধ্যুষিত অঞ্চ লেই নয়, দেশের সর্বত্র যেখানেই পাকিস্তানী জেহাদীরা হত্যালীলা চালাচ্ছে, বারংবার সামরিক বাহিনীকে ডাকা হচ্ছে। সাম্প্রতিক ভারতের বিভিন্ন শহরে লসকর, জয়েস, আলবাদর, সিমি, হুজি ইত্যাদি ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের বোমা বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সর্বশেষ মুম্বাই-এ তাজ-ট্রাইডেন্ট-নরিম্যান ভবনে এই আক্রমণের ব্যাপকতা, তীব্রতা আন্দাজ করা সম্ভব। পাক-সরকার, পাক-সামরিক বাহিনী, পাক-আই এস আই পাকিস্তানের ভারত বিরোধী রাষ্ট্রনীতির অঙ্গ হিসাবে এই আক্রমণ সংঘটিত করে চলেছে। কিন্তু ভারতের কাছে প্রতিবাদ করা ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প নেই। ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক নখদন্তহীন এক নরম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি যাদের একমাত্র পাথেয়। দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যারা অক্ষম, তা কাশ্মীরে, অসমে অথবা ভারতের যে কোনও স্থানেই হোক। অন্যদিকে ভারত মাতার বীর সন্তান সেনাবাহিনীর তরুণ অফিসার জওয়ানরা এই প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অখন্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য সিংহ বিক্রমে লড়াই করে প্রাণ বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না। কারগিল তার সর্বশেষ উদাহরণ। ভারতবাসী নিজেদের ঘরে বসে সেই দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করেছেন।

অনুপ্রবেশ এ রাষ্ট্রে লাগাম ছাড়া, বৈধ ভিসা নিয়ে এদেশে এসে জনারণ্যে হারিয়ে যাওয়া সাধারণ ব্যাপার। গোয়েন্দা বাহিনীও এই অবস্থার মোকাবিলা করতে অক্ষম, পুলিশ বাহিনী অপ্রতুল। সামরিক বাহিনী বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করতে এবং সীমান্ত প্রহরায় ব্যস্ত থেকেও আভ্যন্তরীণ শান্তি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায়, বন্যা, ভূমিকম্পে সেবা করতে প্রায়ই নিয়োজিত হচ্ছেন। জুনিয়র পদের অফিসারদের প্রায় ১২০০০ পদ শূন্য থাকা সত্ত্বেও, এই সমস্ত কাজ তাঁরা কৃতিত্বের সঙ্গে করে চলেছেন।

(এরপর ৪ পাতায়)

ভারত-বিরোধীদের আড়াল করছে

(১ পাতার পর)

যাদের সহজে চেনা যায় না। অথবা চিনেও যেন চিনতে পারি না। এই ঘরের শত্রুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণকারী ভারতীয় মিডিয়া। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা এখন মিডিয়ার দৌলতে ধর্ম শূন্যতা বা নাস্তিকতা। নবীন প্রজন্মকে লাগাতার বোঝাচ্ছে যে ঈশ্বর নেই, পাপ- পুণ্য নেই। ইহজীবনই তোমার একমাত্র জীবন। সুতরাং চূড়ান্ত ভোগ করো এবং প্রয়োজনে অন্যের ক্ষতি করেও নিজে সুখে থাকো। এটা পাশ্চাত্যের ভোগবাদী দুনিয়ার জীবন দর্শন। সনাতন ভারতীয় দর্শন নয়। প্রতিদিন সংবাদপত্রে, টি ভি চ্যানেলের পর্দায় শুধু ভোগ্যপণ্যের হাতছানি। এই হাতছানির কুহকে মুগ্ধ তরুণ ও যুব সমাজ দেশকে ভুলেছে। সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য কী তা জানে না। জানতে চায়ও না। জনক-জননীর জন্ম তারিখ মনে রাখে না। কিন্তু তারা ভ্যালেন্টাইন ডে মনে রাখে। ঘটা করে বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে রোমান্স করে। কোথাও কোনও বিবেক দংশন নেই। দেশ ধর্ম সব চুলোয় যাক। হ্যাঁ, এই শিক্ষাই আজ মিডিয়া দিচ্ছে ভারতের তরুণ প্রজন্মকে। আর এস এস মিডিয়ার চোখের বালি। কারণ, স্বয়ংসেবকরা দেশকে ভারতমাতা জ্ঞানে বন্দনা করে। সনাতন হিন্দু ধর্মের গৌরবের কথা বলে। তাই মিডিয়ার লাগাতার প্রচারে আর এস এস হিন্দু মৌলবাদী সংগঠন। লাগাতার এই অপপ্রচারে ভারতের তরুণ সমাজ যে কিছুটা বিভ্রান্ত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারতের বড় বড় সংবাদপত্র এবং টি ভি চ্যানেলগুলির সবই এখন বিদেশি অর্থে পুষ্ট। তাই দেশের বদলে বিদেশের দাসত্বই এদের ধর্ম। এদের লক্ষ্য।

সংসদ ভবনে জঙ্গি হামলা ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর পরিকল্পিত হামলা। অথচ এই হামলার পিছনে যে ব্যক্তির মস্তিষ্ক কাজ করেছিল তার ফাঁসির আদেশ রদ করার জন্য মিডিয়া ওভার টাইম খাটছে। তাই আজও আফজল গুরুর ফাঁসি হয়নি। মুম্বাই হামলা চলার সময় টি ভি চ্যানেলে চ্যানেলে যে বিকট প্রতিযোগিতা চলেছিল তার নিন্দা করার ভাষা নেই। কম্যান্ডো বাহিনীর জওয়ানরা যখন তাজ এবং ওবেরয় হোটেলের ছাদে নামছে সেই দৃশ্য "লাইভ" টেলিকাস্ট করার জন্য ভিতরে থাকা জঙ্গিরা বাড়তি সুবিধা পেয়ে যায়। পাকিস্তানে বসে লস্কর-ই-তৈবার পরিচালকরা সঙ্গে সঙ্গে সেই খবর স্যাটেলাইট ফোনে জঙ্গিদের জানিয়ে দিচ্ছিল। নিট ফল, জঙ্গিদের খতম করতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। অকারণে বহু প্রাণহানি হয়। তা নিয়ে মিডিয়া মাথা ঘামায়নি। বরং প্রতিটি চ্যানেল দাবি করেছিল তারাই প্রথম কম্যান্ডোদের অবতরণ দেখিয়েছে। মিডিয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অন্যের থেকে বেশি দর্শক তার চ্যানেলে টানা। লক্ষ্য, আর টি পি যথাসম্ভব বাড়িয়ে নিয়ে চ্যানেলের বিজ্ঞাপন আরও বেশি পাওয়া। যাতে পরে চ্যানেলে শহীদ স্মরণের অনুষ্ঠানে বিজ্ঞাপনদাতারা আরও উদারভাবে বিজ্ঞাপন দেয়। চ্যানেল কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করতে পারে। কখনও কী শুনেছেন যে মিডিয়া শহীদ পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার খরচ বহন করেছে। কখনও কী শুনেছেন শহীদ পরিবারকে অর্থ সাহায্য করেছে। গোধরায় ট্রেনের কামরায় আগুন দিয়ে হিন্দু করসেবকদের নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। মিডিয়ার চোখে সেটা ছোটখাট একটা মামুলি ঘটনা। তার প্রতিক্রিয়ায় গুজরাটের শান্তিপ্রিয় হিন্দুরা রুখে দাঁড়ালে নিন্দা সমালোচনার ঝড় তুলেছিল আমাদের তথাকথিত নিরপেক্ষ সেকুলার মিডিয়া। অথচ গোধরার ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে কট্টর মৌলবাদী মুসলমানরা গুজরাটে দ্বিতীয়বার দাঙ্গা বাঁধাবার ষড়যন্ত্র করতে সাহসী হয়নি। মিডিয়া এই সত্যি কথাটা আজও বলেনি।

ইসলামি সন্ত্রাসবাদই ভারতের গণতন্ত্রের একমাত্র শত্রু নয়। লাল চীনের সরবরাহ করা মাওবাদী সন্ত্রাসেরও লক্ষ্য ভারতীয় গণতন্ত্রের বিনাশ। চীনের প্রত্যক্ষ মদতে নেপালে এখন মাওবাদীরা শাসন ক্ষমতা দখল করেছে। প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকুমার দহল ওরফে প্রচণ্ড ব্যক্তিগতভাবে কট্টর ভারত বিরোধী। ভারতকে ধ্বংস করাই তার রাজনীতির একমাত্র লক্ষ্য। অবাক হবেন না যদি দেখেন ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তান এবং পূর্ব-সীমান্তে চীন, বাংলাদেশ এবং নেপালের যৌথ বাহিনী একযোগে ভারত আক্রমণ করেছে।

ভারতের প্রজাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনী

(৩ পাতার পর)

এই পরিস্থিতিতে দেশে যখন ত্রাহি ত্রাহিরব, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নির্মাণ বিভাগ এমনকী বিচার-বিভাগেও ভ্রষ্টাচার ক্যানসারের মতোছেয়ে গিয়েছে;এমতাবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র দাঁড়িয়ে আছে বোধহয় ঈশ্বরের কৃপায়। রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা না থাকলেও বোধহয় এই অবস্থার আরও অধঃপতন সম্ভব নয়।

রাষ্ট্রে সৎ এবং কৃতি মানুষের অভাব নেই। রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁরা যোগ্য বলেই প্রমাণিত হতে পারেন। কিন্তু ক্ষমতার প্রবেশ পথ আজ অধিকার করে রয়েছে অর্থ, ভ্রষ্টাচার, পেশিশক্তি, সমাজ বিরোধী মানুষের মিছিল। ভারতের প্রজাতন্ত্রে খুনের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি সাংসদ হওয়ার জন্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারে। ভ্রষ্টাচারি জনপ্রতিনিধি সাংসদ বিধানসভা থেকে বহিষ্কৃত হন না, কারণ বিচারালয় বিচার সমাপ্ত করে রায় দেননি। হয় তো রায় আগামী ২৫-৩০ বছরেও জানা যাবে না। ফলে সেই ব্যক্তি নিরপরাধ। সংসদে কোটি কোটি টাকার নোটের বান্ডিল সাংসদ কেনা বেচায় প্রমাণ হিসাবে দেশবাসীর সামনে প্রদর্শিত হয় কিন্তু দোষী ধরা পড়ে না।

দীর্ঘ ৩৫ বছর রাষ্ট্রের সুরক্ষায় এক যুদ্ধ থেকে আর এক যুদ্ধে, এক সীমান্ত থেকে অন্য সীমান্তে ছুটে বেড়িয়েছি। আজ জীবন সায়াহ্নে পিছন ফিরে তাকিয়ে বারবারই মনে হয় এই প্রজাতন্ত্রের জন্য বারংবার জীবনের বাজি রাখা কি যুক্তিযুক্ত হয়েছিল? রাষ্ট্র সেই ধরনের সুরক্ষা বাহিনীই পায় যা তার প্রাপ্য। বর্তমানের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ভারত কি এখন রাষ্ট্রের প্রতি সমর্পিত-প্রাণ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা সামরিক বাহিনী পাওয়ার যোগ্য?

সন্ত্রাস রুখতে

(১ পাতার পর)

৯৭টি চেকপোস্ট, ৫৮টি আউটপোস্ট, ৩০টি ব্যারাক গঠনের অনুমোদন করা হয়। এছাড়াও অনুমোদন করা হয়েছিল ২০৪টি টহলদারি আধুনিক ইঞ্জিনের সুবিধাযুক্ত নৌকা। ১৫৩ টি জীপ, ৩১২ টি মোটর সাইকেল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও। উপকূলের থানাগুলোকে আধুনিক কম্পিউটার সুবিধাযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য থানা পিছু ১০ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছিল। ২০০৯-এর এপ্রিলের মধ্যে সকল উপকূলবর্তী থানাতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত ফোর্সও পৌঁছে যাওয়ার কথা। ২৬।১১ মুম্বাই হামলার পরিপ্রেক্ষিতে এই সময়সীমা এগিয়ে আনা হচ্ছে। ২০০৫-এর পরিকল্পনা যদি সময়মতো কার্যকরী করা হত তাহলে হয়তো বা ২৬।১১-র ভয়ানক হামলা এড়ানো যেত।

দারুল-উলুমকে দেদার টাকা

(১ পাতার পর)

বিজ্ঞান ইংরেজি পড়ানো হলেই টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইংরেজি পড়াবে কে? তার জন্য শিক্ষক লাগবে। সেই শিক্ষক অন্য নিয়োগ করার ভার ওইসব সংস্থার হাতেই থাকছে। মৌলভিদের জন্য প্রতি মাসে ভাতা থাকছে। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি সরকার রাজকোষের টাকা খরচ করেই জঙ্গি তালিম ও দেশবিরোধী কাজের জন্য ব্যয় করছে।

যদি মোক্তব, দারুল-উলুমের আধুনিকীকরণের জন্যই সরকার টাকা দেয়, তাহলে সেই টাকা কীভাবে খরচ হচ্ছে তাও দেখা সরকারের কাজ। তা না করে স্রেফ মসজিদে মসজিদে টাকা বিলি করে কার স্বার্থ রক্ষা করছে এই কংগ্রেস সরকার?

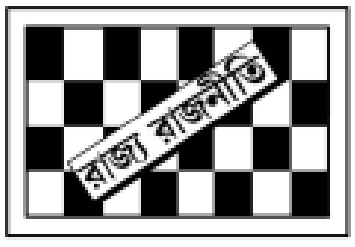

সি পি এমের রাজ্য নেতৃত্ব পার্টিতে কোণঠাসা

নিশাকর সোম

রাজ্যের শাসক বামফ্রন্টের সব দলই আসন্ন লোকসভা নির্বাচন নিয়ে খুবই আতঙ্কিত। ফরওয়ার্ড ব্লক তো আসন বদলের প্রস্তাব নিয়ে সিপিএম-এর দ্বারস্থ হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্লক বারাসাত লোকসভা আসনে দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছে। কারণ এখানে তৃণমূল শক্তিশালী। ফরওয়ার্ড ব্লকের দু'জন সাংসদ আর নির্বাচনে দাঁড়াতে চাইছেন না। অন্যদিকে ফরওয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত বিশ্বাস ও প্রাক্তন মন্ত্রী সরল দেব প্রার্থী হতে পারেন।

আর এস পিও সীট বদলের প্রার্থনা নিয়ে সিপিএম-এর কাছে আলোচনা করতে যাবে। আর এস পি-র বর্তমান এক সাংসদ-কে পার্টি আর মনোনয়ন দিতে রাজি নয়।

এই দু'পার্টির বর্তমান অবস্থায় সিপিএম নেতৃত্ব মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করছে। এই দুই পার্টির বিপ্লবী হুঙ্কার স্তিমিত। এঁদের উপর ভরসা করে বিরোধী কোনও কোনও নেতা কৌশল ঠিক করে থাকেন।

রাজ্য সিপিআই নেতৃত্বের কপালে ভাঁজ পড়ে গেছে, কারণ মেদিনীপুরের কোনও লোকসভার সিটে তাদের জেতার সম্ভবনা নেই। এমতাবস্থায় সাংসদ গুরুদাস দাশগুপ্ত নির্বাচনে না দাঁড়ানোর কথা ভাবছেন বলে জানা গেল। তিনি নাকি মন্ত্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য-কে লোকসভায় দাঁড়াতে বলছেন।

বামফ্রন্টের শরিকদের প্রধান ভরসাস্থল — সিপিএম-এর নৈরাজ্যময় অবস্থা। পার্টি সংগঠনের দুর্বলতা দূর করার জন্য — ব্রাঞ্চ থেকে জেলাস্তর পর্যন্ত ''সাংগঠনিক কনভেনসন'' হচ্ছে। এই কনভেনসনগুলিতে — মুখ্যমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, রাজ্য সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে ভুল নীতি, ঔদ্ধত্য, একগুঁয়েমি ও হাঙ্গামা বৃদ্ধি কারক উক্তির তীব্র সমালোচনা হচ্ছে। একাংশ পার্টি সদস্যদের বক্তব্য — ''বুদ্ধ দেববাবু-কে সামনে রেখে নির্বাচন জেতা যাবে না।'' কেউ কেউ এমন কথাও বলছেন — ''আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগেই মন্ত্রিসভায় পরিবর্তন করা উচিত। শোনা যাচ্ছে মন্ত্রিসভা-কে ছোট করার প্রস্তাবও আসছে। এদিকে কেন্দ্রের বরাদ্দ টাকা সংসদগণ খরচ করতে না পারায় পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সমালোচনা করেছেন। পার্টির এই ডামাডোলের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করছেন মন্ত্রী তথা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুভাষ চক্রবর্তী। তিনি প্রকাশ্যে বলেছেন — ''সোমনাথ চ্যাটার্জি-সৈফুদ্দিনদের পার্টিতে ফিরিয়ে আনা দরকার।'' এই উক্তিকে কেন্দ্র করে পলিটব্যুরোর সদস্য সীতারাম ইয়েচুরি, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্যামল চক্রবর্তী ও রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু বিরূপ মন্তব্য করেছে। এই বিষয় বিতর্ক তুলে দিয়েছেন সুভাষ চক্রবর্তী। সুভাষবাবু এই কথা বলার কারণ হল — তিনি ''বহিষ্কৃত'' নেপালদেব ভট্টাচার্য-কে কেবল পার্টিতেই ফেরত আনেননি — তাঁকে উত্তর ২৪ পরগনার অন্যতম নেতা করেই ক্ষান্ত হননি — নেপালদেব বাবু বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে বক্তব্য রাখছেন।

কলকাতা জেলার পার্টি সদস্যদের এক বড় অংশ অলোক মজুমদার-কে পার্টিতে ফিরিয়ে এনে নেতৃত্বের পদে বসানোর দাবি তুলছে। এ কথা উত্তর কলকাতার একাধিক নেতা এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন।

এদিকে সিপিএম-এর সকল জেলাতেই তরুণ পার্টি সদস্যদের মধ্যে হতাশা গ্রাস করেছে এবং ব্যাপকভাবে নিস্ক্রিয়তা দেখা যাচ্ছে। কারণটা হল, মুখ্যমন্ত্রীর ''আমরা ২৩৫ ওরা ৩৫ — আমরা মার খেলে পালিয়ে আসবো না।'' — এই কথাগুলিকে বহুভারম্ভে লঘুক্রিয়া অন্তসারশূন্য বলে অভিহিত করছেন এই তরুণ সদস্যগণ।

এছাড়া উত্তর ২৪-পরগণাতে সুভাষ চক্রবর্তী তাঁর কব্জাকে দৃঢ় করেছেন। সামনে এনে ফেলেছেন তাঁর একান্ত অনুগত জহর ঘোষাল-কে। সুভাষবাবুর ছক সাজানো শেষ।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, সোমনাথ চ্যাটার্জি নিজেই আর রাজনীতি বৃত্তে থাকতে চান না। শোনা যাচ্ছে, সোমনাথবাবু নাকি বিদেশে কোনও কূটনৈতিক কাজে যোগ দিতে পারেন।

সিপিএম-এর মধ্যে ব্যাপক সংখ্যক সদস্য বসে যাচ্ছেন এবং পার্টি থেকে সরে যাচ্ছেন। পার্টিতে রাখার জন্য বসে যাওয়াদের যেমন একদিকে ''বোঝানো'' হচ্ছে, অপরদিকে বলা হচ্ছে, সরকার যদি উল্টে যায় তখন পার্টি সদস্য সক্রিয় কর্মীরা চার থাপ্পড় খেলে বসে যাওয়ারা আরও বেশি মার খাবেন। কারণ পার্টি তখন তাঁর / তাঁদের পাশে থাকবে না। পার্টি নেতৃত্ব আরও বলছেন যে, ইতিমধ্যে তৃণমূলকর্মীরা বলে বেড়াচ্ছে যে একবার সরকার ওল্টাক — দেখো নেব — মার কা বদলা মার।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সিপিএম-এর পলিটব্যুরোতে যে মূল্যায়ণ হয়েছে তাতেবলা হয়েছে, শিল্পায়ণ স্লোগান সঠিক। তবে পশ্চিমবঙ্গের পার্টি জনগণের থেকে বেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এর মেরামতির জন্য রাজ্য নেতৃত্বকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য নেতৃত্বও জেলা কমিটিকে নির্দেশ দিয়েছে বিধায়কদের ও সাংসদদের পড়ে থাকা কাজ শেষ করা এবং পড়ে থাকা বরাদ্দ টাকা খরচ করা। যেন রিপ-ভান-উইঙ্কি-এর বারো বছর (থুড়ি ৩১ বছর পর) পর ঘুম ভাঙ্লো। যখন পায়ের তলার মাটি ধসে গেছে — তখন দেওয়াল কোথায় যা ধরে বাঁচবে। দ্বান্দ্বিক নীতি প্রয়োগ করে বলা যায়, গতিটা শম্বুক এবং তা ক্রমশ ক্রমশ ঊর্ধে উঠবে। জনগণের ক্ষোভ শম্বুক রূপে এগিয়ে ভোটে সি পি এম-এর বিরোধী হবেই।

ইতিমধ্যে রাজ্য-কমিটির সভায় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নেতৃত্বের ব্যর্থতা, বিশেষ করে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সমীর পুততুণ্ডদের শক্তির প্রকাশের জন্য রাজ্য নেতৃত্ব তীব্র সমালোচনা করেন। এর প্রত্যুত্তরে দক্ষিণ ২৪ পরগণা নেতৃত্ব রাজ্য নেতৃত্ব-এর বিশেষ করে নন্দীগ্রাম ঘটনার জন্য তীব্র সমালোচনা করেছেন। প্রায় প্রতিটি জেলার রিপোর্টে নন্দীগ্রাম-সিঙুর-এর ঘটনার সমালোচনা উপস্থিত করে রাজ্য নেতৃত্ব তথা মুখ্যমন্ত্রী-শিল্পমন্ত্রীর প্রতি বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। এই অবস্থায় দেখা যাচ্ছে রাজ্য নেতৃত্ব কোণঠাসা হয়ে পড়ছে।

“ পার্টিতে রাখার জন্য বসে যাওয়াদের যেমন একদিকে ''বোঝানো'' হচ্ছে, অপরদিকে বলা হচ্ছে, সরকার যদি উল্টে যায় তখন পার্টি সদস্য সক্রিয় কর্মীরা চার থাপ্পড় খেলে বসে যাওয়ারা আরও বেশি মার খাবেন। কারণ পার্টি তখন তাঁর / তাঁদের পাশে থাকবে না। ”

সিপিএমের হাতে মানবাধিকার আক্রান্ত

নবকুমার ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গে আজ মানবাধিকার নির্মমভাবে লঙ্ঘিত। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, লালগড় ছাড়াও প্রত্যেকদিন নানা ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অধিকার নানাভাবে ব্যাহত হচ্ছে। গণতান্ত্রিক অধিকারের রক্ষাকবচ, নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন এ রাজ্যে বহু পূর্বেই প্রহসনে পরিণত হয়েছে। কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচন থেকে শুরু করে স্কুলের পরিচালক সমিতি গঠনের নির্বাচন, পঞ্চায়েত থেকে পৌর নির্বাচন সর্বত্র একই অবস্থা। পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন আজ জনগণের রক্ষকের ভূমিকা পরিত্যাগ করে রূপান্তরিত হয়েছে অত্যাচারী ভক্ষকে। এই ত্রাস সঞ্চারকারী রাষ্ট্রীয় প্রশাসন মানবাধিকারের প্রধান শত্রু।

'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' বলে একটি কথা আজকাল প্রায় শোনা যায়। রাষ্ট্র যখন জনগণের অধিকার কেড়ে নিয়ে স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করতে পুলিশ ও অন্যান্য নিপীড়নের যন্ত্রগুলি নির্বিচারে অপব্যবহার করে তখনই সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। রাষ্ট্র সেখানে দানবের ভূমিকা নেয় মানুষ তাকে ধ্বংস করে আপন অধিকার বলে। সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম এ প্রসঙ্গে অন্যতম নিদর্শন।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীন পুলিশবাহিনী ২০০১ সাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করতে গিয়ে কীভাবে নগ্ন আক্রমণ চালাচ্ছে তার বিস্তৃত তথ্য দেওয়ার পূর্বে, ১৯৭৭ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বামপন্থী ফ্রন্টের ছত্রিশ দফা কর্মসূচিতে নাগরিক অধিকার সম্পর্কে কী বলা হয়েছিল তার দিকে একবার নজর দেওয়া দরকার। ওই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে বলা হয়েছে যে, মেহনতি মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারগুলি তুলে ধরা ও তার পক্ষে দাঁড়ানো এবং এক সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই অধিকারগুলি সংরক্ষণ ও প্রসারের সংগ্রামে জনগণকে সাহায্য করা বামপন্থী ফ্রন্টের নিরন্তর প্রয়াস হবে। উপরোক্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে জনগণের রাজনৈতিক অধিকারকে শুধু সংরক্ষণ নয়, ওই অধিকারকে সম্প্রসারিত করার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করা তো দূরের কথা বরং ভারতের সংবিধানের মধ্যে জনগণকে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে তাও বামফ্রন্ট সরকারের বকলমে সি পি এম দল পুলিশ বাহিনীর সাহায্যে নগ্নভাবে লঙ্ঘন করছে।

১৯৭৪ সালে 'জরুরি অবস্থা'র সময় ভারতের মানুষ এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল। তার সাংবিধানিক স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারগুলি (১৯ নং ধারা) খর্ব করা হয়েছিল। বাক্য ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নাকচ করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই শাসনের অবসান ঘটে জনগণের নির্বাচনের রায়ে ১৯৭৭ সালে। কেন্দ্রে সেই নীরব বিপ্লবের সাফল্যের ছায়ায় পশ্চিমবঙ্গেও আসীন হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার।

১৯৭৭ সালের পরিবর্তন ছিল মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ফল। সেদিন থেকেই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা ভোগ করে আসছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকারকে নির্মমভাবে পদদলিত করছে তারা। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে শুধু পুলিশ বা প্রশাসনের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যারাই সরকারের বিরোধিতা করবে তাদেরই পিটিয়ে ঠাণ্ডা করা হবে। যদিও মুখ্যমন্ত্রী ও সিপিএম

নন্দীগ্রাম

দল বলছে, সরকার এবং পুলিশ প্রশাসন সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, লালগড়সহ যা করছে তা আইন শৃঙ্খলা বাঁচাতেই করছে। অথচ সিপিএমের ১৯৬৮ সালের "আইন ও শৃঙ্খলা বিপন্ন — এই অপপ্রচার ও তার অর্থ" — শীর্ষক দলিল বলছে, 'আমাদের সমাজের বড় বড় পুঁজিপতি, জমিদার এবং অন্যান্য লাগামহীন শোষণকারীদের কাছে 'শৃঙ্খলা' কথাটির অর্থ হল, কেবলমাত্র তাদের লুঠের মুনাফা ও নগ্ন লোভ চরিতার্থ করার জন্য জনসাধারণকে নির্দয় শোষণের বুর্জোয়া জমিদার সমাজব্যবস্থার শৃঙ্খলা। আর 'আইন' বলতে, যা বিনা বাধায় সে ব্যবস্থাকে বজায় রাখে এবং যা জনসাধারণের প্রতিটি গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সংবিধান সাড়ম্বরে প্রতিশ্রুত প্রতিটি অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে পদদলিত করে পুলিশের বেয়নেট দিয়ে জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখে।' ১৯৬৮ সালের'আইন ও শৃঙ্খলা' সম্পর্কে সিপিএম দলের ব্যাখ্যা আজও সমানভাবে প্রযোজ্য। ১৯৬৮ সালের দলিলে 'আইন ও শৃঙ্খলা' প্রসঙ্গে সেদিনের সিপিএম দলের যে ব্যাখ্যা রাখা হয়েছিল আজ তা বদলে গেছে। সেদিনের শাসকদলের কথাই আজ সিপিএম দলের মুখে। বিনয় কোঙার বলেছেন — পুলিশের কাজ তো ছবি আঁকা বা স্কুল কলেজে পড়ানো নয়। পুলিশ তো দমন করারই যন্ত্র। কাকে দমন করবে সেটা সরকার স্থির করে।'

সি পি এম তথা বামফ্রন্টের এই মানবাধিকার হরণের কীর্তি আজকের নয়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই তারা সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে দণ্ডকারণ্য থেকে আগত বাঙালি উদ্বাস্তুদের উপর আক্রমণ ঘটিয়েছিল। ১৯৮২ সালে বিজন সেতুর উপর ১২ জন সন্ন্যাসীকে পুড়িয়ে মেরেছিল। কেশপুর, ডেবরা, শালবনি, খেজুরি বিভিন্ন জায়গায় মানবাধিকার ভঙ্গের অজস্র উদাহরণ রয়েছে। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, লালগড়ের ঘটনায় অনেক বামপন্থী কর্মী পর্যন্ত প্রতিবাদ করেছে। ভদ্রেশ্বরের ভিখারি পাসওয়ান-এর মৃতদেহটা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। নন্দীগ্রামেও অনেক মৃতদেহ গায়েব করা হয়েছে। ছোট আঙারিয়ার ঘটনা কি কেউ ভুলে গিয়েছেন? রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে লালগড়ের আদিবাসী রমণী চিন্তামণি মূর্মুর চোখটাই নষ্ট হয়ে গেল অথচ প্রশাসন কিছু টাকা দান খয়রাত করে দায় সারতে ব্যস্ত। নন্দীগ্রাম সিঙ্গুরের অত্যাচারী কুখ্যাত পুলিশ আধিকারিকদের পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন পুরস্কারে ভূষিত করেছে। দুঃখের বিষয় এখনও নন্দীগ্রামের অত্যাচারিত মানুষজন কোনও বিচার পায়নি।

ছোট আঙারিয়ার ঘটনার বিচার এখনও চলছে, কবে শেষ হবে একমাত্র ভগবান তা বলতে পারবেন। একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানের কাঠামোর মধ্যেই এমন ফ্যাসিবাদী আচরণ যেখানে চলে সেখানে 'প্রজাতন্ত্র দিবস' কথাটাই অর্থহীন। বিদেশী জঙ্গি ও সিপিএম দল এবং তাঁদের প্রশাসনিক জঙ্গিদের অত্যাচারে বাংলার মানুষ আজ অতিষ্ট।

আমরা আর কতদিন এই জুলুমবাজি সহ্য করব? সমাজের সর্বস্তর থেকেই এই রাষ্ট্রীয় গুন্ডামির প্রতিবাদ করা উচিত। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, লালগড় আমাদের পথ দেখিয়েছে। অসৎ প্রজাকে শাস্তিদান করে রাষ্ট্রকে, রাষ্ট্রের অন্য প্রজাদের রক্ষা করা যেমন রাজার কর্তব্য, তেমনি অত্যাচারী রাজাকে ধ্বংস করে রাষ্ট্রকে রক্ষা করাও প্রজার দায়িত্ব। স্বৈরতন্ত্রী ফ্যাসিবাদীদের পর্যুদস্ত করে এদেশে গণতন্ত্রের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখার দায়িত্ব প্রত্যেকটি প্রজার। সে দায়িত্ব আমরা যত দৃঢ়ভাবে পালন করবো, প্রজাতন্ত্র দিবসের সার্থকতা তত বাড়বে।

ভারতীয় অর্থনীতি কতটা স্বাধীন ও প্রজাতান্ত্রিক ?

এন সি দে

একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের যেমন থাকা চাই নিজস্ব ভূমি, নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব সংস্কৃতি, নিজস্ব সংবিধান, সংসদ ও আইন-আদালত, ঠিক তেমনি থাকা চাই একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম অর্থনীতি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা বাস্তবিক সত্য, ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস দল দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে একটি নিজস্ব স্বাধীন অর্থনীতি গড়ে তোলার দিকে নজর দেয়নি। শুরু থেকেই কমনওয়েলথ, গ্যাট এবং ডব্লিউ টি ও প্রভৃতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠনের আওতায় চলে যাওয়ায়, ওই সমস্ত সংগঠনগুলোর মাতব্বর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো আমাদের দেশকে কখনই আত্মনির্ভরশীল নিজস্ব স্বকীয় আদর্শ অর্থনীতিতে বিকশিত হতে দেয়নি। কংগ্রেস দলের অদূরদর্শী, দুর্নীতিগ্রস্ত নেতৃত্বের খামখেয়ালিপূর্ণ আর্থিক নীতির ফলে দেশ ক্রমে ক্রমে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীদের আর্থিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছে ও হচ্ছে।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে কংগ্রেস সরকার ইংরেজ সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমেরিকা, বৃটেনসহ ৭টি দেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত গ্যাটের সদস্য হয়। সাম্রাজ্যবাদীদের এই বাণিজ্যিক সংগঠনটি আত্মপ্রকাশের দিনই অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারি, ইংরাজ সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। একথা বলার অর্থ হল গ্যাট আত্মপ্রকাশ করার প্রক্রিয়ায় ১৯৪৪ সালের অধিবেশন থেকেই ভারত এর সঙ্গে জড়িত ছিল। সেটা ছিল ইংরেজ-ভারত। ৪৮ সালে কংগ্রেস শুধু ইংরেজের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। এর পরিণাম কি হয়েছে? ইংরেজ ভারত ছেড়ে যাওয়ার সময় আমাদের স্বদেশী বা বিদেশী কোনওরকম ঋণই ছিল না। ইংরেজের শত শোষণ সত্ত্বেও আমাদের মূলধন ছিল ৫ হাজার কোটি টাকা। আর ১৯৯২-৯৩ সালে এই ঋণের পরিমাণ বেড়ে হয় ২ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি ডলার। রাজীব গান্ধীর পাঁচ বছরের অপরিণামদর্শী তুঘলকী শাসনে দেশ শুধুই বিদেশী দ্রব্য আমদানী করায় বিদেশী মুদ্রা ভান্ডার তো শূন্য হয়েই ছিল, উপরন্তু বিদেশী ঋণ মেটাতে ৭৬ টন সোনা ইংল্যান্ডের এক ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখতে হয়েছিল। আবার এই সোনা ফেরৎ আনতে পরবর্তীকালে ভারত সরকারকে আই এম এফ থেকে ৭.৫ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ তৎকালীন টাকার মূল্যে ৩৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিতে হয়েছিল।

তৎকালীন টাকার মূল্য সম্পর্কে বলতে গেলে একটা কথা বলে রাখতেই হয় যে, এই রাজীব গান্ধীর মা ইন্দিরা গান্ধীর আমলেই কিন্তু ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য ৫৮ শতাংশ কমানো হয়েছিল। ১৯৫০-৫১ সালে টাকার মূল্য ছিল ১ ডলারে ৪টাকা ৭৬ পয়সা, আর ১৯৬৬ সালে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে এই মূল্য হয় ডলার প্রতি ৭ টাকা ৫০ পয়সা। অর্থাৎ ডলার পিছু আগের চেয়ে বেশি টাকা চলে যেতে শুরু করল বাণিজ্যে। শুরু হল বাণিজ্য ঘাটতি। রাজীব গান্ধীর আমলের শেষে এই মূল্য নেমে দাঁড়ায় ১৭ টাকা ৯৪ পয়সায়। এই উভয় ক্ষেত্রেই টাকার অবমূল্যায়ন ঘটানো হয়েছিল আই এম এফ-এর টাকার লোভে। এখন তো টাকার মূল্য কমে ১ ডলারে ৫০ টাকারও বেশিতে দাঁড়িয়েছে। ইন্দিরা, রাজীব এবং মনমোহন এই তিন কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীর আমলেই দেশকে তুলে দেওয়া হয়েছিল আই এম এফ-র হাতে। আজ যেমন মনমোহন সিং তার উপদেষ্টা হিসাবে আই এম এফ'র আমলা রঘুরাম রাজনকে নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছে, সেদিনও ইন্দিরা আই এম এফ'র চাপে অশোক মেহতাকে নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই অবমূল্যায়নের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে বাণিজ্য ব্যয় বেড়ে গেছে। ১৯৫০-৫১ সালে বিদেশ থেকে আমদানী করতে খরচ হত ১ ডলার পরিমাণ জিনিসের জন্য ৪টাকা ৭৬ পয়সা মাত্র, আর আজ সেই পরিমাণ জিনিসের জন্য খরচ করতে হচ্ছে ৫০ টাকা অর্থাৎ প্রায় ১০ গুণ টাকা। আর জিনিস রপ্তানী করেও মিলছে কম ডলার। মাত্র ১ডলার খরচ করেই বিদেশীরা ৫০ টাকার জিনিস নিয়ে চলে যাচ্ছে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা যেখানে আই এম এফ'র লোক সেখানে রপ্তানী বণিজ্য বাড়াতে দেবে না, এটাই স্বাভাবিক। দেশের বাজারে বিদেশী দ্রব্য আমদানী করানোই তাদের কাজ। আর রপ্তানীর তুলনায় আমদানী বাড়ালে বাণিজ্য ঘাটতি হবেই অর্থাৎ দেশের ভান্ডার শূন্য হবেই। সেটাই হয়েছে। গত সেপ্টেম্বরেই বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১০ বিলিয়ন ডলারে। আর বিদেশী মুদ্রা-ভান্ডার কমে দাঁড়িয়েছে ২৪২ বিলিয়ন ডলারে। জুন '০৮-এ ছিল ৩০২ বিলিয়ন ডলার।

এ তো গেল স্বাধীন ভারতের পরাধীন অর্থনীতির এক ধরনের নমুনা। অন্যদিকে রয়েছে সিদ্ধান্তহীন, খামখেয়ালী, তুঘলকী পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এক সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় অর্থনীতি পরিচালনার চটকদারী রাষ্ট্রীয়করণের পথটাই বেছে নেয় কংগ্রেস নেতৃত্ব। শুরু হয় ব্যক্তি মালিকানাধীন রুগ্ন, ফোঁপরা, লোকসানে চলা, ঋণগ্রস্ত কল-কারখানাগুলো অধিগ্রহণ করে সেগুলোর ঋণের বোঝা সরকারের কাঁধে নিয়ে নেওয়া। ১৯৫১ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের সংখ্যা যেখানে ছিল মাত্র ৬টি,নেহরুর মৃত্যুর সময় সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ৭৪। এগুলোর পিছনে খরচ ১৯৫১ সালের ২৯ কোটি থেকে বেড়ে হয় ২৪১৫ কোটি।

আর ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় বসেই দেখলেন সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নের তাঁবেদারি করলেই জনগণকে বেশি বোকা বানানো যায়, আবার দেশীয় পার্টিগুলোকেও কব্‌জা করা যায়। তাই তিনি ঢালাও রাষ্ট্রায়ত্তকরণ শুরু করলেন। তাতে কমিউনিস্ট পার্টিগুলোও খুশি হল, শ্রমিক-কর্মচারীরাও খুশি হল। চাকরি পাকা হল, কারখানায় লোকসান হলেও লাটে উঠবে না, কারণ লোকসান বহন করবে সরকার। হলও তাই। ১৯৮০-৮১ সালের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে লোকসান বেড়ে দাঁড়ালো ৭৬০ কোটি টাকায়। সমাজবাদী অর্থনীতির পরিণামে ব্যক্তি পুঁজি পরিণত হল আমলাতান্ত্রিক পুঁজিতে। শুরু হল আমলাতন্ত্র ও শাসকদল নিয়ন্ত্রিত লাইসেন্স-পারমিট-র কোটা রাজ, ব্যাপক স্বজন-পোষণ, রাষ্ট্রীয় পুঁজি শাসকদলের কাজে ব্যবহার, মিশ্র অর্থনীতির নামে সাদা বাজারের পাশাপাশি কালোবাজারের রমরমা। ১৯৮৯ সালে রাজীব জমানায় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প পুনর্গঠনের জন্য একটি কমিটি বসানো হয়েছিল। কিন্তু World Bank, IMF'র চাপে সেই রিপোর্ট আজও প্রকাশ করা যায়নি।

ইতিমধ্যে ১৯৮০ সালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চরম আর্থিক সংকটে পড়ে; আবার ৮০'র দশকের শেষ দিক থেকেই শুরু হয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের পতন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভারতের মতো পরনির্ভরশীল অর্থনীতির উপর নির্ভর করে বাঁচার নতুন রাস্তা নিল। গ্যাটের ডিরেক্টর জেনারেল আর্থার ডাংকেলকে দিয়ে ১৯৯০ সালে ২০ ডিসেম্বর "ব্রাসেল্‌স"- এ একটি প্রস্তাব পেশ করানো হল। এটিই সর্বনাশা "ডাংকেল প্রস্তাব" নামে কুখ্যাত। সাম্রাজ্যবাদের দালাল দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেস সরকার ১৯৯৪ সালে এই প্রস্তাব হস্তাক্ষর করল। ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে তৈরি হল সর্বগ্রাসী "বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organisation) বা WTO। মেরুদন্ডহীন দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেস সরকার চালিত ভারত সরকার শুরুতেই এর জালে আটকে গেল। ঠিক যেমন শুরুতেই গ্যাটের জালে আটকে পড়েছিল। ভারতীয় স্বার্থকে বলি দিল,বথ-র যূপকাষ্ঠে। এর আগেই IMF'র টাকার লোভ তাদের শর্তে নরসীমা রাও-মনমোহন সিং-এর কংগ্রেস সরকার ১৯৯১ সালের জুন থেকে শুরু করে দিল নয়া আর্থিক নীতি, নয়া শিল্পনীতি। এক কথায় Liberalisation (উদারীকরণ) ও Globalisation (বিশ্বায়ন)-র তত্ত্ব। শুরু হল ঢালাও বেসরকারীকরণ। নেহরুর Temples of India রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে রাতারাতি আখ্যা দেওয়া হল Graveyard of India অর্থাৎ ভারতের কবরস্থান হিসেবে।

WTO'র চাপে একদিকে শুরু হল রুগ্ন দেখিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে বেসরকারী শিল্পে রূপান্তর, অন্যদিকে এই বেসরকারি শিল্পগুলি যেন চলতে না পারে তার জন্য ক্রমান্বয়ে আমদানী শুল্ক কমানো। সস্তায় আমদানীকৃত শিল্পদ্রব্যের সঙ্গে যাতে দেশীয় শিল্পদ্রব্য টিকতে না পারে তার জন্য উৎপাদন শুল্ক (Excise Duty) বাড়ানো ও বিদেশে রপ্তানী যাতে করতে না পারে সেইজন্য রপ্তানী শুল্কও ছড়্প্রম্নক্সজব্ধ ডড্ডব্ধঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দেওয়া প্রভৃতি।

পেটেন্ট আইন সংশোধন করে জেনেরিক ড্রাগস-এর ব্যবসায়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলোর নাভিশ্বাস তুলে দেওয়া হল। বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাগুলোকে Exclusive Marketing Rights দিয়ে দেওয়া হল। ইতিমধ্যেই ভারতীয় অগ্রণী ওষুধ কোম্পানী Ranbaxy বিক্রি হয়ে গেছে। প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে ইস্পাত শিল্প, কয়লা শিল্প, তেল শিল্প ধুঁকছে।

দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেসী অপশাসনে ভারতীয় অর্থনীতির জীর্ণ চাকা গোঙাতে গোঙাতে এগিয়ে চলেছে ভারত মহাসাগরের দিকে। এখনই যদি কোনও প্রকৃত দেশদরদী ভারতীয় চিন্তাধারা ও বৈভবে বিশ্বাসী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এই অর্থনীতির হাল না ধরেন তবে এই অর্থনীতির সলিল সমাধি ভারত মহাসাগরে হতে বাধ্য।

ভারত যদি মরে তবে ভারত মহাসাগরের নাম কী অটুট থাকবে?

"কংগ্রেসী অপশাসনে ভারতীয় অর্থনীতির জীর্ণ চাকা গোঙাতে গোঙাতে এগিয়ে চলেছে ভারত মহাসাগরের দিকে। এখনই যদি কোনও প্রকৃত দেশদরদী ভারতীয় চিন্তাধারা ও বৈভবে বিশ্বাসী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এই অর্থনীতির হাল না ধরেন তবে এই অর্থনীতির সলিল সমাধি ভারত মহাসাগরে হতে বাধ্য।"

পূর্ব ভারতে অভ্যন্তরীণ নির

কর্ণেল (অবঃ) সব্যসাচী বাগচী

ভূমিকা : জ্ঞান ও শৌর্যের মেলবন্ধন একটি জাতি বা রাষ্ট্র জীবনকে গৌরবান্বিত করে। একটি বিশেষ সীমানাযুক্ত অঞ্চলের নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ আগাগোড়া খুঁটিয়ে দেখার সময় উপরিউক্ত আপ্তবাক্যটিই মাথায় আসে। তাই হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্থানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যা আমাদের মাতৃভূমির সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা তা আমাদের জীবনকে মহিমান্বিত করে তুলবে।

ঋষি অরবিন্দকে প্রতিধ্বনিত করে আমি বলতে চাই — আমাদের প্রাচুর্য, আমাদের দোষ-ত্রুটি, আমাদের অধ্যবসায়, আমাদের শিক্ষা, জীবনধারণের জন্য উপার্জন, আমাদের জ্ঞান, এবং বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ, আমাদের কাজ, আমাদের ত্যাগ — সব যাঁকে কেন্দ্র করে আবির্ভূত হচ্ছে, তিনি আমাদের ভারতমাতা।

হিংসা তাড়িত, ধনসম্পদ তাড়িত, জ্ঞান তাড়িত আজকে যে ক্ষমতার কাঠামো, টয়েনবিকে উদ্ধৃত করে আমরা বলতে পারি, যদি আমরা নিজেদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই এবং মানব সভ্যতাকে বাঁচাতে চাই তাহলে একমাত্র উপায় হল ভারতীয় জ্ঞান ও শৌর্যকে আহরণ করা। যেহেতু ভারত এর কেন্দ্রবিন্দু, সেই কারণে দরকার শক্তিশালী ভারত — স্বামীজীর কথায়, এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ। তাই ভারতের ঐক্য রক্ষা করা যেতে পারে জাতীয় সংহতি বিরোধী কিছু আঞ্চলিক শক্তি (যেমন উলফা, কে এলও ইত্যাদি) এবং আন্তর্জাতিক ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন (যেমন- আই এস আই, হুজি, এল ই টি)-কে প্রতিহত করে, তা তাদের লক্ষ্য এবং সংগঠন যেমনই হোক না কেন।

বর্তমানে পরিবর্তনশীল বিশ্ব

আজকের দিনে পরিবর্তনশীল বিশ্বে ভারত স্বতন্ত্র অর্থাৎ অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। সুতরাং দেখা যাক সেখানে কী ধরনের পরিবর্তন সংগঠিত হচ্ছে। পাঁচটি অবস্থার (পরিবর্তনশীল) ধারা এখন বর্তমান বিশ্বে পরিবর্তনের জন্য দায়ী। ভারতবর্ষ তার আয়তন আকার জনসংখ্যা দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ নিয়ে সহজেই সেই পরিবর্তনকামী চাপ আর আক্রমণের মুখে অবিচল থাকতে পারে। যেখানে কোনও ক্ষুদ্র আঞ্চলিক পরিচয়ভুক্তরা মোটেই তা পারে না। স্বাভাবিকভাবেই, বর্তমান ভারতের ভূগোল অপরিবর্তিতই রয়েছে।

পরিবর্তনগুলি হল -

১. সাংস্কৃতিক আধুনিকীকরণ : অধিক শিক্ষা, অধিক কর্মরতা স্ত্রীলোক এবং অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলা নগরায়ণ এর জন্য দায়ী।

২. অর্থনীতির বিশ্বায়ন : প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুততার দরুণ অসহায়তাই এর কারণ।

৩. বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ : সময় ও জায়গা এই দু'য়ের অভাব এবং নেটওয়ার্কিং-এর জাল — এর জন্যই এটি ঘটছে।

৪. ব্যবসা পরিচালনায় স্বচ্ছতা : ব্যবসা-বাণিজ্য এবং মেধা সম্পদ অধিকার (Intellectual Property Rights (IPR) -ব্যবস্থার স্বচ্ছতা।

৫. সামাজিক অভিযোজন ও উন্নয়ণ : নিত্য-নতুন চ্যালেঞ্জ যথা নবতম সুযোগ-সন্ধানের দিকে লক্ষ্য রেখে নেতৃত্বদানই এই সঙ্কট সৃষ্টি করেছে।

আজকের দিনে উপরিউক্ত সবকটি বিষয়ই দূরে সরে থাকার থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জনগণ ও জাতিকে উদ্বুদ্ধ করছে একসাথে মিলিত হতে, পরস্পর কাছে আসতে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যেমন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ান, দুটি জার্মানী, দুটি ভিয়েতনাম এবং দুটি ইয়েমেন। সুতরাং আবার ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষকে দেখার স্বপ্ন দেখতেই পারি আমরা।

আজকের দিনে পৃথিবীতে ক্ষমতার অনেকগুলি কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে, নতুন নতুন রেওয়াজ চালু হচ্ছে, বণিক সঙ্ঘ ও রাজনৈতিক আগ্রহে নিরূপিত হচ্ছে বহুমুখী সহযোগিতা এবং পারস্পরিক নির্ভরতার নবতম সংজ্ঞা। কিন্তু তাদের প্রকৃতি যাই হোক না কেন, জাতি বা রাষ্ট্রের অস্মিতা বা স্বাভিমানবোধ কিন্তু আজও বিরাজিত। জাতি তাকেই বলা যায় যার রাজনৈতিক স্থায়িত্ব রয়েছে, যা অভ্যন্তরীণভাবে সুরক্ষিত, অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, যার সংস্কৃতি মহৎ, যার প্রশাসনিক দৃঢ়তা রয়েছে, যার সরকারি ও বেসরকারি সিস্টেম বা ব্যবস্থা ত্রুটিহীন এবং যার সংবিধানে ভারসাম্য রয়েছে এবং তা পরীক্ষিত। ঘটনাচক্রে ধারণা অনুযায়ী :

১. উন্নতি (সবসময় ইতিবাচক) — বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কেন্দ্র করে হওয়া উচিৎ। এটি সংস্কৃতি ও পরিচিতির দিক দিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২. আধুনিকতা : যা অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎকে ভিত্তি করে হওয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে জরুরি সুশাসনের ভাগিদার হওয়া।

৩. উন্নয়ণ (ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই অর্থে) — উন্নয়ণ স্বাধীনতা নিয়ে আসে। যে স্বাধীনতা হল একপ্রকার সুযোগ। অসুস্থতা, ক্ষুধা, নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য থেকে যে স্বাধীনতার জন্ম তা হয়তো কারুর পরিচয়ের মর্যাদা দেয়। জীবনের মানোন্নয়ণের জন্য চারটি পুরুষার্থকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে স্বাধীনতা। আটটি মৌলিক উপাদান রয়েছে, যেমন — উচ্চ আয়, উন্নততর শিক্ষা, উন্নত স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, দূষণহীন পরিবেশ, সাম্য, অধিক সুযোগ সুবিধা, বৃহত্তর ব্যক্তি স্বাধীনতা, উন্নততর সাংস্কৃতিক জীবন। অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা ও শান্তি উন্নয়ণের এই সবকটি উপাদানকে সুরক্ষিত রেখেছে।

উপরিউক্ত ধারণা ও সংজ্ঞাগুলি স্পষ্ট করার পর আমি দেখাতে চাই যে, একটি দেশের জনগণ, তার অর্থনীতি, বিশ্বের কৌশলগত শক্তির পেরিপ্রেক্ষিতে তার অবস্থান ও আপন সামর্থ্যের নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর নির্ভর করে :

১. কীভাবে তাদের পরিচালনা করা হবে?

২. কীভাবে তারা উন্নতি করবে?

৩. কীভাবে তাদের সুরক্ষিত রাখা হবে?

বর্তমান বিশ্ব-অর্থনীতিতে ভারত একটি বড় শক্তি হিসাবে প্রতিভাত হচ্ছে (আগামী ২০২০ সালের মধ্যে যে ৪২টা দেশের সামগ্রিক উৎপাদন হার ১০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে ভারত তাদের মধ্যে অন্যতম)। সুতরাং সেই ভারতভূমি যার ক্ষুদ্রতর সংহতিপূর্ণ অংশটিকে অভ্যন্তরীণ সুরক্ষিত রেখে, আগামী দিনে বিশ্বের দরবারে নেতৃত্ব দেবার জন্য এবং বিপর্যয়ের হাত থেকে মানব সভ্যতাকে রক্ষার জন্য নিজেকে বিশ্বের ভবিষ্যৎ নেতা হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

নিরাপত্তা ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ

সাম্প্রতিক পশ্চাদ্‌পট:

২৬।১১ (২০০৮-এ ভারতের ২৬ নভেম্বর)-এ মুম্বাই-এ ইসলামিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ৭২ ঘন্টার যুদ্ধ এখন ভারতের ৯/১১ (২০০১-এ আমেরিকার ১১ সেপ্টেম্বর) হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। তবে তাজ, ওবেরয়, নরিম্যান হাউস কিন্তু সেদিনকার নিউইয়র্কের ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্রের মতো ধসে পড়েনি বা বিস্ফোরণে উড়ে যায়নি। কিন্তু যেটা ধসে পড়েছে তা হল ইউ পি এ বা কংগ্রেস সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা — ভারতবর্ষকে সুরক্ষিত রাখার জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এবং তোষণকেন্দ্রিক ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে সুরক্ষিতরাখার জন্য ভারতীয় সংবিধানের ক্রিয়াবিধির যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভারসাম্যের নিরিখে কেন্দ্র ও প্রদেশ উভয়েরই পরিকাঠামো কিন্তু সেক্ষেত্রে উন্নত হতে পারেনি। সংকট তৈরি হয়েছে অস্তিত্বের, গোয়েন্দা বাহিনীর মধ্যে ঐক্যের অভাবে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় টাস্ক ফোর্সকে একক নেতৃত্বের অধীনে (যেমন আমেরিকার হোমল্যান্ড সিকিউরিটি) আনতে না পারার জন্য বিদেশী রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত নিয়ে বা না নিয়ে কিছু দেশদ্রোহী ব্যক্তি বা সংগঠন অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আক্রমণ শানিয়ে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি করতে পারছে।

ভারতের স্থিতিশীলতা ও সংহতি বিনষ্ট করার জন্য আত্মঘাতী মুসলিম সন্ত্রাসবাদীরা অস্ত্র-শস্ত্র, বিস্ফোরক এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম, আই ই ডি নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রস্তুত। তারা ভারতের অন্তর্গত সমুদ্র উপকূলের (২০ নটিক্যাল মাইল যা প্রায় ৮০০ কিমি-র মত) খুব কাছে এসে পড়েছে। আধুনিক কলা-কৌশল, স্যাটেলাইট, গ্লোবাল পজিশনিং সার্ভিস (জি পি এস), স্যাট-ফোন, নৌ-বাহিনী নিয়ন্ত্রিত জলযান কিন্তু এরই সাক্ষ্য দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই এদের দ্বারা ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বাই নগরী শারীরিকভাবে আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু এদের আসল লক্ষ্য ভারতের জাতীয় গর্বের বিভিন্ন স্থান ও প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্রগুলিতে আক্রমণ করে এদেশের নাগরিকদের আত্মবিশ্বাস ও আদর্শে চিড় ধরানো। মানবিক দুর্ঘটনার দিক দিয়ে মুম্বাই হামলার ঘটনাটিতে হতাহতের পরিসংখ্যান নেহাত কম নয়। সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী ২৪৬ জন মৃত এবং প্রায় ৩০০ জন আহত। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন ৬টি দেশের ২২ জন বিদেশী, ৯ জন সন্ত্রাসবাদী এবং ২০ জন এন এস জি কমান্ডো ও পুলিশ।

শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে, সন্ত্রাসবাদীরা একের পর এক জাতীয় গর্বের কেন্দ্রবিন্দুগুলি আক্রমণ করে গেছে। যেমন — দিল্লীর লাল কেল্লা (২০০০), ভারতীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থান সংসদ ভবন (২০০১) -এ হামলা, (সেই ঘটনার দোষী আফজলকে এখনও ফাঁসিতে ঝোলানো হয়নি), আক্রান্ত হয়েছে ধর্মীয় স্থান অর্থাৎ মন্দির ও মসজিদে হামলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে (২০০৫-এ দিল্লীর দেওয়ালিতে)-এ হামলা। আক্রমণ করা হয়েছে বিজ্ঞানকেন্দ্রগুলিকে যেমন ব্যাঙ্গালোর-এ (২০০৫), অর্থনৈতিক কেন্দ্র যেমন মুম্বাইকে (১৯৯৩ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত বহুবার এবং এমনকী জলপথেও), এছাড়াও আক্রান্ত হয়েছে গুয়াহাটি ২০০৮-এ অক্টোবরে, পর্যটন কেন্দ্র জয়পুর (২০০৮) । — এই লম্বা তালিকা শেষ হবার নয়। এবং মুম্বাই-এ ২০০৮ নভেম্বর হামলা মোটেও এধরনের শেষ ঘটনা নয়, যদি না সরকার তার ভোট-ব্যাঙ্কের দিকে লক্ষ্য রেখে এখনও পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় অপদার্থ আর সন্ত্রাসবাদের প্রতি নরম নীতি নিয়ে চলেন। আসলে ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতিই উৎসাহিত করছে ইসলামিক ছায়া যুদ্ধ কে। যার দ্বারা ভারত নামক রাষ্ট্রটি এক ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন বা একথাও বলা যায় বাংলাদেশ পাকিস্তানের মদতপুষ্ট ও অন্যান্য জঙ্গি সংগঠনগুলি খুব সুকৌশলে ব্যবহার করছে ভারতের মতো সন্ত্রাসবাদের প্রশ্নে নরম একটি দেশকে। সুতরাং এর সমাধান একটিই হতে পারে। রক্ষণাত্মক নিরাপত্তা ব্যবস্থার পূর্বে সীমানা পেরিয়ে আক্রমণ চালানোই অগ্রাধিকার পাওয়া দরকার।

শুধুমাত্র গোয়েন্দা সংস্থাকে দোষারোপ করে বা পরস্পর কলহ করে এবং শুধুমাত্র পুলিশি সক্রিয়তাই এই বিপজ্জনক প্রবণতা রোধ করতে পারবে না। আমরা ইজরায়েলের মতো ভাবতে পারি এবং যখন সেই সময়টা এসেই পড়েছে। তখন মুম্বাই-এর ঘটনাটাকে জেগে ওঠার অন্তিম ডাক হিসাবে ধরে নিয়ে এগোতে হবে। সবসময় প্রতিক্রিয়া জানানোর পরিবর্তে ভারতের দরকার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হবার সব ইচ্ছাশক্তিকে

(এরপর ১০ পাতায়)

ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা

(৯ পাতার পর)

সংগ্রহ করার। যাই হোক, মুম্বাই ঘটনার পরবর্তী পর্যায়ে (এক বছর পূর্বে সতর্কবাণী পেলেও অবিচল ছিল সরকার) ভারত সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে আস্থা গড়ে তুলতে (Confidence Building Measures) দৃঢ় মনস্থ করেছে। ও পক্ষকে দু'চক্ষে সহ্য না করা এবং কোনও নির্বোধ আবেদন না করা হতেই পারে এই ধরনের সন্ত্রাসবিরোধী পদক্ষেপের ভিত্তি। পদক্ষেপ নিতে হবে আল কায়দার বিরুদ্ধে, এল ই টি অনুমোদিত সন্ত্রাস-কৌশলের বিরুদ্ধে। এর চারটি পর্যায় রয়েছে। ১৯৮০-১৯৯০ দশক পশ্চাদ্‌পদ ইসলামিক সংগ্রাম, ১৯৯০-২০০১ দশক বিশ্বজুড়ে চমকপ্রদ জেহাদের উত্থান, ২০০১-২০০৭ স্থানীয় গেরিলা সন্ত্রাসের পূর্ণতা প্রাপ্তি; ২০০৮-আন্তর্জাতিক গেরিলা সন্ত্রাসের সূচনা; (তথ্যসূত্র : হিন্দুস্থান টাইমস্, ১ ডিসেম্বর; ২০০৮ Battle around Mumbai, special Page-5)। তাই গোয়েন্দা বিভাগকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে খবর সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, উৎপাদন এবং বার্তার ব্যাপ্তিকরণ সময়োপযোগী করে তুলতে হবে।

নতুন নিরাপত্তার রূপ

গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য ভারতের পূর্বদিক এখন প্রতিরক্ষা কৌশলের নতুন কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে প্রতিভাত হচ্ছে। চীন, চীনের পেছনে মায়ানমার, ইসলামিক মৌলবাদ নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ, মাওবাদী নেপাল এবং অসমের সন্ত্রাস ছড়ানো অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহীরা; পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার ও ঝাড়খন্ডের মাওবাদীরা এবং সর্বোপরি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা — ১.২৫ কোটি রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, ৫৫ লাখ অসমে, ৪ লাখ ত্রিপুরায়, বিহার ও ঝাড়খন্ডে ৪.৫ লাখ।

সব মিলিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দেওয়া তথ্যানুযায়ী ১.৮ কোটিরও বেশি অনুপ্রবেশকারী ওই অঞ্চলে বিপদ সংকেত বয়ে এনেছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ২৯৪টি আসনের মধ্যে ৬৪টি আসন এবং অসম বিধানসভার ১১২টি আসনের মধ্যে ৫৬টি আসনের ভাগ্য নির্ধারণ করবে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরাই। শুধু মাত্র ভারতের সীমান্তে দেওয়া তারের বেড়াকে (বাংলাদেশের সঙ্গে ৪০৯৬ কিমি দীর্ঘ সীমারেখা — যার মধ্যে ১১৬৭ কিমি দীর্ঘ বেড়া দেওয়া হয়েছিল ২০০৫-০৭ সালে; যদিও বর্তমানে ৮৫৪ কিমি এলাকা জুড়ে দেওয়া বেড়ার এখন আর কোনও অস্তিত্বই নেই) আক্রমণ করে নিশ্চুপ থাকাই নয়, অনুপ্রবেশকারীদের দৌলতে ভারতের সীমারেখা পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলা গুলিতে অর্থাৎ ১৮টি জেলার মধ্যে ৯টি জেলার ৬৬টি ব্লকে ৬ থেকে ১১ কিমি ব্যাপী ভেতরে স্থানান্তরিত হয়েছে। অনুপ্রবেশকারীরা (উদ্বাস্তু নয়) সীমান্ত জেলাগুলিতে জনসংখ্যাগত ভারসাম্যের মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে। জাতীয় সুরক্ষার প্রশ্নে বিপদের বার্তা বয়ে এনেছে হাজার হাজার বৈধ ও অবৈধ মাদ্রাসা (আই বি রিপোর্ট অনুযায়ী এ রাজ্যে ৫০৬টি বৈধ ও ১৪৭৭ টি অবৈধ মাদ্রাসা রয়েছে)। এর কারণ এগুলি হুজি, আই এস আই, আল কায়দার নিরাপদ স্বর্গে পরিণত হয়েছে। যারা বামফ্রন্টের ভোট ব্যাঙ্ক রাজনীতির জন্য সাম্প্রদায়িক প্রশাসনিক কাজের মদত পাচ্ছে। বাইরের ও ভেতরের এই চাপের সঙ্গে লড়তে স্থানীয় অঞ্চলের রাজনীতি কোনওভাবেই সমর্থ হবে না। দৃঢ় কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাবাহিনীর গঠনই পারে আমাদের পুনরায় দেশভাগের হাত থেকে রক্ষা করে, বৃহত্তম ইসলামিক বাংলাদেশ (জনপ্লাবনের অনুপ্রবেশজনিত মাধ্যমে সে দেশে অন্তর্ভুক্তিকরণ তত্ত্বানুযায়ী) গঠনের পরিকল্পনায় বাড়া ভাতে ছাই দিতে বা ১৯৪৭-এর মন্ত্রে পুনরায় ভারত-বিভাজন রোধ করতে।

এখন তাই নয়া নিরাপত্তার ছাঁচ হওয়া দরকার এরকম—

১. বৃহত্তর সাংস্কৃতিক সংহতির জন্য জরুরি পদক্ষেপ।

২. যুদ্ধে পদার্পণের জন্য উন্নত পরিকল্পনা।

৩. চীনা প্রভাব হ্রাস করা।

৪. সুদৃঢ় কেন্দ্র — সেই সঙ্গে দরকার নতুন সন্ত্রাস বিরোধী আইন ও যুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামো। (NIA-এর মতো)।

৫. উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্রদান এবং অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

৬. সন্ত্রাস দমন বাহিনীর হাতে আরও আইনি ও অন্যান্য ক্ষমতা প্রদান।

গুয়াহাটিতে সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ।

৭. সাংবিধানিক প্রয়োগের মাধ্যমে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে জাতীয় ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সরকার প্রতিষ্ঠা করা জরুরি।

মোদ্দা কথা, উপরিউক্ত প্রত্যেকটি বিষয় আলাদাভাবে খুঁটিয়ে দেখে রূপায়ণ করতে হবে।

উপসংহার

অনুসন্ধান, অনুমান এবং আলোচিত প্রতিকারের বিভিন্ন উপায়ই কিন্তু এ বিষয়ে শেষ কথা হতে পারে না; এর জন্য দরকার অনেক বেশি গভীর ও চিন্তাশীল বিশ্লেষণ। আমাদের একটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত যে, আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে আর কখনই বিভাজিত হতে দেব না। কারণ আমরা এক জাতি — এক সংস্কৃতি, এক ভারতীয় জনগণ। এই জাতি, আঞ্চলিকভাবে ভাষাগতভাবে-জাতিগতভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে জেগে উঠতে বাধ্য। এখন আমাদের চ্যালেঞ্জ তাদের উদ্বুদ্ধ করা, যে 'আমরা জনগণ' এবং সেটাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য যেটি প্রয়োজন তা হল সাধারণ মানুষকে একটি পক্ষ হিসাবে গড়ে তোলা। যাতে নাগরিক জীবনের সঙ্গে জাতীয় ঐক্যের এক নিবিড় মেলবন্ধন গড়ে ওঠে।

(গত ২৫-২৬ ডিসেম্বর ২০০৮ চেন্নাই-এ অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্রে 'অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার যোজনা এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই' অনুযায়ী লিখিত)

লোকমান্য তিলকের ঐতিহাসিক কারাদণ্ড— প্রেক্ষাপট ও প্রতিক্রিয়া

ডঃ প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের তিনজন প্রবাদ পুরুষ ছিলেন লোকমান্য তিলক, মহাত্মা গান্ধী আর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁরা তিনজন জনমানসে যতটা দাগ কেটেছিলেন বোধকরি আর কেউ সেই কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন না। ১৯২০ সালের আগে লোকমান্য তিলক আসমুদ্র হিমাচল সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ১৯২০ সালে তিলকের মহাপ্রয়াণ হয় আর সে বছরেই সর্বভারতীয় গণ আন্দোলনের ডাক দিয়ে গান্ধীজী জাতীয় রাজনীতিতে একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সশস্ত্র অভিযানের নায়ক নেতাজী সুভাষ জনপ্রিয়তার শিখরে ওঠেন এবং স্বয়ং গান্ধীজী তাঁকে জাতীয় সংগ্রামের 'রাজাধিরাজ' বলে অভিনন্দিত করেন। ঐতিহাসিক বিচারে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর ঐতিহ্য থেকে সরে এসে লোকমান্য তিলকের ঐতিহ্যকে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছিলেন।

এবার আসল কথায় আসি। বিশ শতকের শুরুতে ভারতের জাতীয় সংগ্রাম প্রাণবন্ত, গণমুখী ও সংগ্রামী চরিত্র ধারণ করেছিল। এই পালাবদলের নির্ণায়ক মুহূর্ত ছিল বাংলার স্বদেশী আন্দোলন। (১৯০৫-১৯০৮) স্বদেশী আন্দোলন ছিল এক সার্বিক আন্দোলন। এতটা আবেগ, অনুভূতি ও স্বদেশপ্রেমের ভাববন্যা আগে কখনও দেখা যায়নি। "সোনার বাংলা", "ও আমার দেশের মাটি", "বাংলা দেশের হৃদয় হতে" প্রভৃতি গানের মাধ্যমে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বাঙালির গভীর স্বদেশপ্রেমকে চিত্রিত করেছিলেন। 'বন্দেমাতরম্' স্বদেশপ্রেমের মন্ত্র ও রণসঙ্গীতে পরিণত হয়। সবচেয়ে বড় কথা, স্বদেশী আন্দোলন নিছক বাংলার আঞ্চলিক পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এর ঢেউ সমগ্র ভারতকে স্পর্শ করেছিল। বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব যেমন হয়ে উঠেছিল আন্দোলনের স্নায়ুতন্ত্র, তেমনি স্বদেশী শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল এই কালপর্বে। স্বদেশী উদ্যোগে দেশে ইস্পাত কারখানার ভিত্তি রচনা করলেন জামশেদজি টাটা আর স্বদেশী স্টিম নেভিগেশন কোম্পানী স্থাপন করলেন চিদাম্বরম্ পিল্লাই।

আর সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য অগ্নিসাধনার কর্মযজ্ঞ। আলোচ্য সময়ে

তিলক

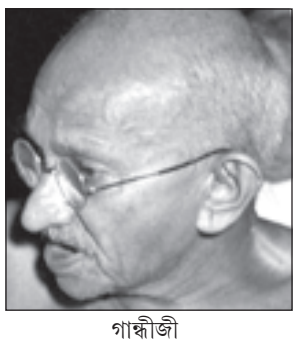

গান্ধীজী

নেতাজী

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে, আর তার মুখ্য রূপকার ছিলেন লাল-বাল-পাল নামে কথিত লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পাল। এই ত্রিমূর্তি সম্মিলনে উদ্ভূত নব জাতীয়তাবাদের দার্শনিক' নামে কথিত শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর মতে প্রয়োজনে আপোষ নয়, সংঘাত। রাজনৈতিক বেদান্তের সূত্র চয়ন করে তিনি লিখেছিলেন রাজনীতি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। কেমন হবে নেতৃত্বের আবরণ? তাঁর সম্পাদিত বন্দেমাতরম্ পত্রিকার "Wanted, a Policy" শীর্ষক সম্পাদকীয়তে মহাভারত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখলেন —

"If the leader fear and faint, then all behind him feint and fear. So a king of men should keep a dauntless look and forehead clear".

বরাভয় মন্ত্রে দীক্ষিত বলিষ্ঠ জননায়কের যে ভাষ্য অরবিন্দের ভাষ্যে পাই তারই সার্থক প্রতিরূপ ছিলেন লোকমান্য তিলক। একশত বছর আগে তাঁর ঐতিহাসিক কারাদণ্ডকে কেন্দ্র করে আদালতের ভেতরে ও বাইরে যে ঝড় উঠেছিল তার আনুপুঙ্খিক বিবরণ পাওয়া যায় সে সময় মুম্বাই থেকে প্রকাশিত দি টাইমস্ অফ্ ইন্ডিয়া কাগজে। সেই ঐতিহাসিক আলোড়নকারী ঘটনার প্রেক্ষাপটে প্রতিক্রিয়া ও তাৎপর্য তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

উনিশ শতকের শেষ লগ্নে সমান্তরালভাবে দুটি ঐতিহাসিক প্রবণতা চোখে পড়ে। একদিকে জর্জ নাথানিয়াল কার্জন বড়লাট হয়ে ভারতে এলেন এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের শৃঙ্খলকে সুদৃঢ় করাই ছিল তাঁর পবিত্র কর্তব্য। ভারতের ভেতরে, বাইরে সাম্রাজ্যবাদের ইমারত মজবুত করার জন্য তিনি সতত যত্নবান ছিলেন। এই সাম্রাজ্যবাদী শাসনের দম্ভ, ভারত-বিরোধী হৃদয়হীন শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর মনে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। রক্তবর্ণ শাসকচক্ষু লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন —

"ওদের আঁখি যত রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুটবে
ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে
মোদের বাঁধন টুটবে।"

সাম্রাজ্যবাদী দানবীয় শাসনের ভিত্তি শিথিল করার ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক ছিল মহারাষ্ট্র। সেখানেই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ শুরু হয় — আর তার প্রবীণতম প্রবক্তা ছিলেন লোকমান্য তিলক। তাঁর জীবন ও ধ্যান-ধ্যারণা ভারতের মুক্তি সংগ্রামে "মরাগাঙে বান" সৃষ্টি করে, সেই ধারাই পরিব্যাপ্ত ও বেগবতী হয়ে ওঠে স্বদেশী আন্দোলনের ঝড় ঝাপটার যুগে। ১৯০৮-এ তিলকের কারাদণ্ড কেন, কীভাবে শাসক শ্রেণীর ঘুম কেড়ে নিয়েছিল তারই প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছিল পূর্ববর্তী এক দশকে। জাতীয় রাজনীতিতে তিলক যুগের সূচনা এই কালপর্বেই।

তিলক ছিলেন জন্মসূত্রে মহারাষ্ট্রের চিতপাবন ব্রাহ্মণবংশীয়। পেশোয়াদের সময় থেকেই মহারাষ্ট্রের রাজনীতি, প্রশাসনে চিতপাবন ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটিশ আমলে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ নিয়ে তারা সামাজিক প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। উনিশ শতকের শেষে মহারাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা সকলেই ছিলেন চিতপাবন বংশোদ্ভূত। বিচারপতি রাণাডে, লোকমান্য তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলে ও সশস্ত্র বিপ্লবের পথিকৃৎ বাসুদেব ফাড়কে প্রত্যেকেই এই সামাজিক স্তর থেকে উঠে এসেছিলেন। এদের মধ্যে লোকমান্য তিলক মহারাষ্ট্রে বৃটিশ বিরোধী গণরাজনীতির মুখ্য সংগঠক ছিলেন। মারহাট্টা ও কেশরী পত্রিকার মাধ্যমে জনমানসে স্বদেশ প্রীতির অনুরাগ সিঞ্চিত করেছিলেন। গণপতি পূজা ও শিবাজী উৎসবের মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিকে সংকীর্ণ পরিসর থেকে বৃহত্তর সামাজিক পরিধির আঙ্গিনায় প্রসারিত করেন। সক্রিয় জাতীয়তাবাদের মানসিক পরিবেশ রচিত হওয়ার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি মানুষের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী রোষানল সৃষ্টি করে।

প্লেগ মহামারীর প্রকোপে মানুষের জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে। সরকারি ত্রাণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও প্রশাসনের জনবিরোধী মনোভাব দেখে জনতার মনে ক্ষোভ চরমে ওঠে। এরই পরিণতিরূপে ১৮৯৭ খৃস্টাব্দের ২২ জুন পুণার দু'জন ব্রিটিশ আধিকারিক ব্যান্ড ও আয়ার্স্টকে দামোদর ও বালকৃষ্ণ চাপেকার নামে দুই তরুণ ভ্রাতৃদ্বয় হত্যা করে। এই ঘটনায় সমস্ত মহারাষ্ট্রে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এরপর ২৭ জুলাই 'কেশরী' পত্রিকায় শিবাজী সংক্রান্ত তাঁর রচনার সূত্র ধরে তিলক গ্রেপ্তার হলেন। বিচারে তিলককে আঠারো মাসের সশ্রম কারাদন্ডের সাজা দেওয়া হল। তিলকের কারাদন্ড দেশে-বিদেশে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ইংল্যান্ডে ম্যাক্সমূলার, দাদাভাই নৌরজী, উইলিয়াম হান্টার, রমেশচন্দ্র দত্ত যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে তিলকের শাস্তি মুকুব করার আবেদন জানান। কিন্তু বৃটিশ সরকার কর্ণপাত করলেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বৃটিশ মালিকানাধীন 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' তিলক-এর ঘোরতর সমালোচনা করে। এমন কী বলা হয়েছিল তিলক সন্ত্রাসের রাজনীতিতে

(এরপর ১২ পাতায়)

লোকমান্য তিলকের ঐতিহাসিক কারাদণ্ড

(১১ পাতার পর)

মদত দিয়েছেন। তিলক 'টাইমস অফ ইন্ডিয়ার' বিরুদ্ধে আদালতে গেলেন এবং বিচারকের আদেশে পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হয়।

সক্রিয় জাতীয়তাবাদের সূচনা মহারাষ্ট্রের আঞ্চলিক বৃত্তে ঘটলেও তা এক দশকের মধ্যেই দেশব্যাপী এক বিকল্প পথ ও পন্থা হিসাবে রূপান্তরিত হয়। এর মূলে ছিল ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের আগমন। জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সক্রিয় জাতীয়তাবাদীরা প্রভাবশালী হয়ে উঠলেন। বেনারসে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন থেকেই সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তারা কংগ্রেস মঞ্চে নিজেদের বিকল্প নীতি উপস্থাপিত করেন। ১৯০৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে সংস্কারবাদী ও সংগ্রামী ধারণার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা চলে। পরের বছর ১৯০৭-এর ডিসেম্বরে সুরাটে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মেলনে উভয়পক্ষের সংঘাত প্রকাশ্য রূপ নেয় এবং কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব আন্দোলনের প্রধান স্নায়ুকেন্দ্রে পরিণত হয়। মহারাষ্ট্রের লোকমান্য তিলক, পাঞ্জাবের লাল লাজপত রায় ও বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল এই আন্দোলনের তিন প্রতীকী চরিত্র হয়ে উঠলেন। জাতীয় রাজনীতিতে এই তিন ব্যক্তিত্ব ''লাল-বাল-পাল'' নামে পরিচিত হলেন। এদিকে সরকারের দমন নীতি ও বিভেদ নীতি সক্রিয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গণ-আন্দোলনের উপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল। এরই পরিণতি হল বিপ্লববাদের অগ্নি সাধনা। বাংলা মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব— তিনটি অঞ্চলেই বিপ্লববাদী তৎপরতা শুরু হল। বাংলার বিপ্লববাদের ঋত্বিক শ্রীঅরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় ''New Conditions' নামে সম্পাদকীয়তে (২৯ এপ্রিল, ১৯০৮) লিখলেন কঠোর অগ্নিসাধনার দিন আগত প্রায় (''The fair hopes of an orderly and peaceful evolution of self government which the first energies of the new movement had fastered are gone for ever. Revolution bare and grim is preparing her battlefield.'')

তিলকের কারাদন্ডের আপাত প্রেক্ষিত ছিল কেশরী পত্রিকায় 'দেশের দুর্ভাগ্য' (The countary's Misfortune) নামক প্রবন্ধ প্রকাশ। কেশরী'র প্রবন্ধে তিলক কিংসফোর্ডকে হত্যার প্রচেষ্টায় ক্ষুদিরাম বসু ও কলকাতার জাতীয়তাবাদী নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তারের তীব্র সমালোচনা করেন। তিলক লিখেছিলেন, শ্বেতাঙ্গ আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা ঘোরতর স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছে এবং সাধারণ মানুষের উপর দমন পীড়ন শুরু করেছে। এই প্রবন্ধটি প্রশাসনের কাছে দেশদ্রোহিতার সমতুল বলে বিবেচিত হয় এবং ১৯০৮ সালের ২৪ জুন ভারতীয় পেনাল কোডের ১২৪ ও ১৫৩ ধারায় তিলককে অভিযুক্ত করা হল। তিলকের জামিনের আবেদন খারিজ করা হল। উল্লেখ্য, তিলকের পক্ষে আইনজীবী হিসাবে সওয়াল করেছিলেন মুম্বাইয়ের শীর্ষস্থানীয় আইনজীবী মহম্মদ আলি জিন্না। এরপর সেবছরের ১৩ জুলাই ঐতিহাসিক বিচার শুরু হল। তিলকের বিচার নিছক এক ব্যক্তির বিচার ছিল না, ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নটিই এই বিচারের মর্মবস্তু ছিল। দীর্ঘ একুশ ঘন্টা ধরে তিলক আত্মপক্ষ সমর্থনে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি মুক্তি অর্জনের মৌলিক অধিকারের বিষয়টি উপস্থাপিত করেন। তাঁর ভাষায় ''It is one's inherent right to fight for the liberty of his people, for a change in the government. ২২ জুলাই ছয় বৎসর নির্বাসনের রায় ঘোষিত হল।

তিলকের কারাদন্ড মুম্বাইয়ের সর্বস্তরের মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তুলল। দীর্ঘ ছয়দিন ধরে ধর্মঘট পালিত হল। পুলিশ বেপরোয়া দমন নীতির আশ্রয় নেয়। সরকারি মতে পুলিশের গুলিতে ১৪ জন নিহত ও ত্রিশ জন আহত হয়েছিলেন। বেসরকারি মতে নিহতের সংখ্যা ছিল ত্রিশ আর আহত হয়েছিলেন শতাধিক ব্যক্তি। মহারাষ্ট্র ছাড়া ভারতের অন্যত্র প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। কলকাতার পত্র-পত্রিকাগুলি তিলকের কারাদন্ডের বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর হয়। বিলাতের সংবাদপত্রেও সমালোচনা দেখা যায়। টাইমস পত্রিকা লিখেছিল ''Tilak remained at the movement of his conviction, the most conspicuous politician in India''. বিশ্বের অন্যত্রও তিলকের কারাদন্ডের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। মুম্বাইয়ের ধর্মঘট প্রসঙ্গে রাশিয়ার ভি আই লেনিন লিখেছিলেন "ভারতের শ্রমিক শ্রেণী সচেতন রাজনৈতিক গণসংগ্রামের স্তরে উঠেছে। বোধ করি ভারতে রাশিয়ার মতো স্বৈরাচারী কায়দায় পরিচালিত বৃটিশ শাসনের দিন শেষ হতে চলেছে'' (বিশ্ব রাজনীতিতে দাহ্য উপাদান, আগস্ট ১৯০৮)। লেনিনের অনুগামী ভারতীয় কমিউনিস্টরা ভেবে দেখুন গণ জাতীয়তাবাদের শীর্ষ নেতা তিলককে হিন্দু ঐতিহ্যবাদী নেতা বলে চিহ্নিত করবেন কিনা! তিলকের কারাদন্ড রদ করার জন্য মুম্বাই হাইকোর্টে আপীল করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা খারিজ হয়ে যায়। ছয় বৎসর নির্বাসিত জীবন যাপনের জন্য তিলককে সুদূর মান্দালয়ে পাঠানো হল। ১৯১৪ সালে তাঁর দীর্ঘ নির্বাসনের অবসান হয়।

লোকমান্য তিলক গান্ধীযুগের পূর্বে ভারতের শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন। সঠিক অর্থেই তাঁকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক বলা চলে। তিলকের নীতি ও নেতৃত্ব থেকে তিনটি বিষয় ফুটে ওঠে। প্রথমত, ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিদেশী ভাবধারায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, জাতীয় সংগ্রামকে নিছক আপোষমুখী ও সংস্কারবাদী খাতে পরিচালনা করা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। সংগ্রামের পথেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালিত করতে হবে। তৃতীয়ত, সাধারণ মানুষকে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে গ্রোথিত করতে হবে। সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ আর গণ-জাতীয়তাবাদ একে অন্যের কাছে সম্পৃক্ত। আজকের ভারতে দিশাহীন রাজনীতিকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে হলে তিলকের নির্দেশিত পথ ও পন্থা অপরিহার্য।

বিচারের বাণী নীরবে কাঁদে

গোপীনাথ দে

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন — "সমস্ত ক্ষমতা জনগণের হাতে তুলে দিতে হবে"। গান্ধীজীর "গ্রাম স্বরাজও" প্রকারান্তরে একই কথা বোঝায়। এইসব আশা-আদর্শ মাথায় রেখে বি আর আম্বেদকরকে শীর্ষে রেখে স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আম্বেদকরজী এই গুরুদায়িত্ব পালন করেন এবং তখনকার ভারতবর্ষের বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পরামর্শক্রমে প্রজাতান্ত্রিক ভারতবর্ষের একটি বিশাল সংবিধান রচনা করেন। আর সেই সংবিধান গ্রহণ করা হয় ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি। সেই কারণেই প্রতি বৎসর আমরা ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস রূপে পালন করি । যদিও তারপর বহুবার এই সংবিধান সংশোধন হয়েছে কিন্তু মূল কাঠামো ঠিকই আছে।

আজ যদি কোনভাবে বি আর আম্বেদকর স্বর্গ থেকে একবার পশ্চিমবঙ্গে নেমে আসতেন, তাহলে দেখতেন কিভাবে এখানে সংবিধানকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে পার্টিবিধান চালু হয়েছে এবং তাই দেখে হয়তো তাঁর প্রবল হার্ট অ্যাটাক হতো।

প্রজাতন্ত্রী ভারতবর্ষের সংবিধানের মূলত তিনটি স্তম্ভ — (১) আইন সভা (লোকসভা ও বিধানসভা) (২) প্রশাসন এবং (৩) বিচারবিভাগ। প্রথমেই বিচার বিভাগের কয়েকটা কথা বলা যাক। গত ৫ আগস্ট ২০০৮ তারিখে সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দুই বিচারপতি বি এন আগরওয়াল এবং জি এস সিংভি, কোর্টের নির্দেশ পালন করতে সরকার ব্যর্থ হওয়ায় বলেন যে, "ঈশ্বরও বাঁচাতে পারবেন না দেশকে"। তাঁরা বলেন, "সরকারের কাজ কর্মে আমরা হতাশ হয়ে পড়েছি। আমলাদের বিরুদ্ধে কথা বলার ক্ষমতা নেই সরকারের। এদেশে মাঝেমধ্যে বিচার বিভাগের অতিসক্রিয়তা সম্পর্কে বলা হয়। অথচ প্রশাসনের দোষেই বিচার বিভাগ অতি সক্রিয় হতে বাধ্য হয়।" দেশের শীর্ষ আদালতের শীর্ষ বিচারকদের যদি এই বক্তব্য হয় এবং তাঁরা যদি দেশের সরকার (প্রশাসন) সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েন, তাহলে আমরা সাধারণ মানুষ কোথায় যাব এবং কি করব?

আবার আমাদের পশ্চিমবঙ্গে শীর্ষ নেতারা ওইসব শীর্ষ বিচারকদের সম্পর্কে কী ভাবেন এবং কী ভাষায় ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেন তারও নজির রয়েছে। একজন শীর্ষ নেতা তো বিচারককে কটাক্ষ করে বলেই ফেললেন — "লালা বাংলা ছেড়ে পালা" (প্রকাশ থাকে যে বিচারকের পদবি ছিল "লালা")। যদিও ওই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জন্য সাজা হয়েছিল ওই নেতার; তবুও উচ্চ আদালতে পুনরায় বিচারের জন্য আবেদন করবেন বলে বালতি হাতে রাস্তায় ভিক্ষায় নেমেছিলেন এমন ছবিও সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়েছে। অপর আর একজন নেতা কোনও কারণে বলেই ফেললেন যে, বিচারকদের মাহিনা বাড়িয়ে দিলেই চলবে।

অপরদিকে উচ্চ আদালতের অপর একজন বিচারকের বাড়ি নিলাম করতে হল; কারণ যে ভূ-খণ্ডের উপর তাঁর বাড়িটি নির্মিত হয়েছে সেই ভূমি খণ্ডটি হস্তান্তরিত হয়েছে বেআইনি ভাবে। এ থেকে বোঝা গেল ওই বিচারকের চরিত্র।

নিম্ন আদালতগুলিতে বিচারকগণ কোনও মামলায় সরকারের বিরুদ্ধে রায়

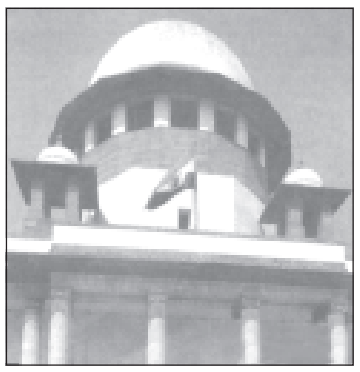

দিতে ভয় পান, এটা আজ জলের মতো পরিষ্কার। কারণ তিনি জানেন, সরকারের বিরুদ্ধে কোনও মামলায় রায় দিলে বা শাসকদলের কোনও নেতা-নেত্রীর বিরুদ্ধে রায় দিলে সেই বিচারকের বাড়িতে হামলা হতে পারে বা কোনও অঘটন ঘটে যেতে পারে; তাই তিনি বদলির জন্য চেষ্টা করেন অথবা মামলার রায়টা এমনভাবে লেখেন — যাতে করে "সাপও না মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে"। অর্থাৎ এরকম রায় দিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে যান। ফলে মামলাটি উচ্চ আদালতে পুনরায় বিচারের জন্য আবেদন করতে হয়। এইভাবে একটি মামলার নিষ্পত্তির জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয়, অজস্র ব্যয় হয় এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো বিচার প্রার্থীর মৃত্যুও ঘটে যায় বিচারের রায় পাবার আগেই। এইভাবে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদতে থাকলে কি আমরা বলতে পারব আমাদের প্রজাতন্ত্র বিপন্ন নয়।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মন্ত্রীসভার একজন দাপুটে মন্ত্রী নির্বাচনের সময় নমিনেশন ফর্মে নিজেকে বি এ পাশ বলে উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু পরে জানা গেল উনি মাধ্যমিক পাশ। সেই কারণে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনতে চাইলে, স্পিকার ওই প্রস্তাব নাকচ করে দেন। কারণ স্পিকার যে দলের টিকিটে নির্বাচিত ওই মন্ত্রীও সেই দলের, তাই সেখানেও দলতন্ত্র। অপর আর এক মন্ত্রী যিনি বর্ধমানের সাঁইবাড়ির হত্যাকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার অপরাধে বেশ কয়েক বছর জেল হাজত খেটেছেন, তিনি বর্তমানে মন্ত্রীসভার দাপুটে মন্ত্রী হিসাবে বিধানসভায় ও রাইটার্স বিল্ডিং-এ শোভা বর্ধন করছেন। এঁরা আইন প্রণেতাও বটে এবং প্রশাসনের হর্তাকর্তাও বটে। এর পরেও কি বলা যাবে প্রজাতন্ত্র বিপন্ন নয়!

পার্টির বড় নেতা, কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। দিনের পর দিন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিদ্যালয়ে যান না। তাই হাজিরা খাতা বাড়িতে চলে আসে এবং মাসে মাসে মাহিনাও ঠিক ঠিক ভাবে পকেটে আসে! এ দৃশ্য আজকের পশ্চিমবঙ্গে দুর্লভ নয়! আবার ক্ষেত্র বিশেষে নেতার পরিবর্তে অন্য আর একজন বিদ্যালয়ে ক্লাশ নিয়ে আসেন এমন উদাহরণও আছে।

কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল দেশের প্রাচীনতম হাসপাতাল হওয়ার পরেও পশ্চিমবঙ্গের রোগীরা ভেলোর যাওয়ার জন্য লাইন দিয়ে অপেক্ষা করে এবং হাওড়া স্টেশন থেকে রোগীদের ভেলোরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ ট্রেন চালু হয়েছে।

অপরদিকে শহরে সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ছাত্রের অভাবে উঠে যাচ্ছে, কিন্তু প্রাইভেট স্কুলগুলিতে ছাত্র উপচে পড়ছে। লালগড়, ঝাড়গ্রামে উপজাতির মানুষেরা অভাবের তাড়নায় আজও পিপীলিকার ডিমের ঝোল খেয়ে দিন কাটায়। দেশের ২৫ শতাংশ মানুষ আজও রাত্রে পেটে ক্ষুধা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। যদিও বাম সাংসদদের এম পি কোটার উন্নয়ণের টাকা খরচ হয় না। বছরের পর বছর কোটি কোটি টাকা পড়ে থাকে। ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের গেটওয়ে রূপে পশ্চিমবঙ্গ রূপান্তরিত হয়েছে এবং সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, লালগড়ে এসব কিছুরই বহিঃপ্রকাশ ঘটছে প্রতিবাদ রূপে। তাই বলি শত শহীদের রক্তে রাঙানো এই স্বাধীনতা, এই প্রজাতন্ত্র বিপন্ন হতে আর বাকি কি আছে?

‘হুজি’কে নিয়ে তদারকি সরকারের পথেই কি হাঁটবেন হাসিনা ?

তারক সাহা

আমাদের দেশে যেসব সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ ঘটেছে, সেগুলির বেশ কয়েকটি পেছনে রয়েছে হুজি। যার মূল্য কেন্দ্র হল বাংলাদেশ। তদারকি বাংলাদেশ সরকার দেশের সবচেয়ে ভয়ানক জঙ্গি সংগঠন হুজিকে রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এটা নিশ্চিতভাবে সরকারের রাজনৈতিক মতলবের নানা দিক খুলে দিয়েছে। ফকরুদ্দিন আহ্মেদের নেতৃত্বে তদারকি সরকার প্রায় দু'বছর ক্ষমতায় থেকে দাবি করেছিল যে, ওই সরকার দেশে সংস্কার রূপায়িত করেছে। তার আরও দাবি ছিল যে, দুর্নীতি দমনে সক্ষম হয়েছে সরকার। কিন্তু হুজিকে স্বীকৃতি দেওয়ার এই সরকারি সিদ্ধান্ত নস্যাৎ করেছে সেই দাবিকে এবং বাস্তবিক অর্থে সরকারি সিদ্ধান্তের বিষয়গুলির পিছনে কী মতলব কাজ করেছে তা নিয়েও প্রশ্ন খাড়া হয়েছে।

অতীতের যে সব তথ্য সামনে এসেছে তাতে দেখা গেছে, এই সরকার ইস্‌লামি গোষ্ঠীগুলির কাজকর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট নরম বা উদাসীন। যদিও এই সময়কালে জাগ্রত মুসলিম জনতা (বাংলাদেশ) গোষ্ঠীর ছয় নেতার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে সন্ত্রাসবাদী হিংসা দমন করেছে ঠিকই, কিন্তু তদারকি সরকার এই সন্ত্রাসবাদী শক্তি খর্ব করতে যা যা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা নেয়নি। অভিযোগ উঠছে যে, তড়িঘড়ি ওই ছয় নেতার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পেছনে কারণ হল যে, ওই ছয় নেতার কার্যকলাপের পিছনে যে সব সংস্থা বা ব্যক্তি আর্থিক বা নৈতিক সমর্থন যুগিয়েছে, তাদের নাম ফাঁস করে দিত।

এর আগে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান বাংলা দেশের অন্যতম ইসলামি জঙ্গি নেতা মুফতি আব্দুল হান্নানকে ঢাকায় ২০০৫ সালের ১ অক্টোবর গ্রেপ্তার করে। হান্নানের আন্তর্জাতিক জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল এবং সে হুজির বাংলাদেশ শাখার অপারেশন কমাণ্ডার। ‘র‍্যাবের’ কার্যালয়ে বসে হান্নান সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছে যে, বাংলাদেশে অবস্থানকালে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র তথা বাণিজ্যমন্ত্রী আলতাফ হুসেন তাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন যে, সে নির্ভয়ে বাংলাদেশে থাকতে পারে। হান্নান আদালতেও কবুল করেছে যে, কয়েকজন প্রভাবশালী মন্ত্রী তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাকে শেখ হাসিনার হত্যার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, তদারকি সরকারের আমলে হান্নান কিংবা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তদারকি সরকারের আশংকা ছিল যে, এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে সরকার বিপাকে পড়বে এবং সরকারের মুখোশ খুলে গিয়ে আসল মুখ বেরিয়ে যাবে।

তদারকি সরকার ক্ষমতায় এসে ‘দুর্নীতি দমন’ শুরু করে। প্রকৃত অর্থে এই ‘দুর্নীতি দমন’ অভিযান হল দেশের মূল দুই রাজনৈতিক দল বিএনপি এবং আওয়ামী লিগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন। পরিণামে ওই দুই দলের নেতাদের ধরপাকড় শুরু হল। অথচ মিডিয়ার চাপে জামাত-এ-ইসলামি দলের মতিউর রহমান নিজামিকে গ্রেপ্তার করে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়।

গত ৬ অক্টোবর ২০০৮-এ জামাত দলের সাধারণ সম্পাদক আলি আহ্সান মহম্মদ মোজাহিদের বিরুদ্ধে ব্যারাকপুরিয়া কয়লাখনি দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। সরকারি তরফে বলা হল সে পলাতক। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, ওই নেতাই ১৫ অক্টোবর ২০০৮-এ সরকারের সঙ্গে আলোচনায় উপস্থিত ছিল। মোজাহিদকে পরে ঢাকায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা যায় ওই মাসের ১০ এবং ১১ তারিখে। স্পষ্টত, এর দ্বারা প্রমাণিত হল তদারকি

সরকার ইসলামিক দলগুলির প্রতি কতটা নরম।

তদারকি সরকার পুরোপুরি বে-আব্রু হয়ে গেল যখন সবচেয়ে ভয়ানক বাংলাদেশী জঙ্গি সংগঠন হুজিকে রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ৩০ এপ্রিল ১৯৯২ সালে ঢাকায় আফগান যুদ্ধের নায়কদের অন্যতম শেখ আবদুস সালামের হাত ধরে হুজির জন্ম হয় এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে। তারাই পাহাড়ি বনাঞ্চলে মাদ্রাসার ছাত্রদের অস্ত্র ট্রেনিং দেওয়া শুরু করে। পরে এইসব প্রশিক্ষিত যুবকদের আফগানিস্তানে পাঠানো হয় সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে। হুজি সদস্যদের মায়ানমারেও পাঠানো হয় সেদেশের সেনাদের বিরুদ্ধে লড়তে।

বিভিন্ন নামে হুজি

হুজি বিভিন্ন নামে তাদের কাজকর্ম শুরু করে বাংলাদেশে। আন্তর্জাতিক মহলে হুজি কালো তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসবাদী দল হিসেবে পরিচিত। এর নেতারা ‘ইসলামিক গণ আন্দোলন’ নামে একটা দল তৈরি করে। বি এন পি পরিচালিত চার দলীয় জোটের শাসনকালে এই গণ আন্দোলনের কার্যকলাপ চলত গোপনে। কৌশলগত কারণে সেসময় গণআন্দোলনের কার্যধারা জামাত-উল-মুজাহিদিনের কার্যকলাপ থেকে পৃথকভাবে চলত। পরে গণ-আন্দোলনের নাম বদলে ‘সচেতন ইসলামী জনতা’ রাখা হল ১৯ আগস্ট ২০০৬ সালে এবং সেই সময়ে সরকারের সাথে এক সমঝোতা করা হল যাতে তারা খোলা ময়দানে তাদের কাজকর্ম চালাতে পারে। গত জানুয়ারিতে তদারকি সরকার ক্ষমতায় আসার পর, এরা তৎকালীন সরকারের কাছ থেকে কাজকর্ম চালাবার অনুমতি নেবার চেষ্টা শুরু করে এবং অবশেষে ২০০৮ সালের মে মাসে এই কাজে সফল হয়। এরপরেই মে ১৮, ২০০৮ সালে ইসলামি ডেমোক্রেটিক দলের জন্ম হল এবং নতুন সংগঠনের উপদেষ্টা কাজী আজিজুল হকের বক্তব্য অনুযায়ী এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ২০০-৩০০ জন আফগান যুদ্ধ ফেরৎ কট্টর মুসলমান।

হুজির গোপন কাজকর্ম

হুজির অপারেশন কমান্ডার মুফতি হান্নান ২০০৫ সালে গ্রেপ্তারের পর থেকে জেলেই বন্দী রয়েছে। হুজির অন্যান্য শীর্ষ নেতারা বর্তমানে ইসলামি ডেমোক্রেটিক পার্টির সঙ্গে যুক্ত এবং হুজির যাবতীয় সন্ত্রাসমূলক কাজের দায় মুফতি হান্নান এবং আবদুর রউফের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। এরা মুফতি হান্নানকে খাড়া করলো হুজির এক গোষ্ঠী নেতা হিসেবে। এরা বলছে, ১৯৯৮ সালেই হান্নানকে হুজি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

হুজি খুব সন্তর্পণে তাদের ধর্মীয় কাজকর্মও চালাতে শুরু করে। এদের নেতা আজিজুল হকের কথায়, “আমাদের লক্ষ্য হল মদিনার নির্দেশ মতো দেশ চালানো যেখানে ধর্ম-মত নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার থাকবে।” আজিজুল আরও বললেন, তাদের লক্ষ্য হল ইসলামিক ধর্মীয় আইন শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করা শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য। অন্যান্য ধর্মমতের সংখ্যালঘুরা দেশের আইন ও তাদের সম্প্রদায়ের আইন মেনে চলবে।

হুজির দাবি সরকার তাদের কাজকর্ম চালাবার অনুমতি দিয়েছে এই শর্তে যে তারা অহিংসভাবে শরিয়ত আইন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ চালাবে। এর অর্থ হল তদারকি সরকারের শান্তিপূর্ণ ভাবে শরিয়ত আইন প্রতিষ্ঠায় লক্ষ্যে হুজির কাজে কোনও আপত্তি নেই। হুজির এই পদ্ধতির সঙ্গে জামাতের পদ্ধতির মিল রয়েছে।

(এরপর ১৬ পাতায়)

নিহত প্রজাতন্ত্রের কাহিনী

(২ পাতার পর)

সম্প্রদায়ের বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কিন্তু অধরা রয়ে গেছে মুসলিম সমাজের এই ব্যাপারগুলো — সেগুলো দেশের আইনের ঊর্ধে? মনে রাখতে হবে সরলা মুদগুলের মামলায় (১৯৯৫) মাননীয় বিচারপতি কুলদীপ সিং লিখেছিলেন — 'no community can oppose the introduction of uniform civil code for all citizens in the territory of India¼''

কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থবোধ একটা বিরাট বৈষম্যকে জিইয়ে রেখেছে। ডঃ জে সি জোহারী মন্তব্য করেছেন, 'Thus, the personal law of the Hindus has been drastically changed....But the question of reforming the Muslim community stands untouched'— (ইণ্ডিয়ান গভর্ণমেন্ট অ্যাণ্ড পলিটিক্স, পৃ : ৪০৩)। এটা সংবিধানের অবমাননা নয়?

তাহলে নিশ্চয় সব কিছুর চেয়ে ক্ষমতার রাজনীতি বড় জিনিষ!

তৃতীয়ত, প্রজাতন্ত্রের সাফল্যের জন্য দরকার সহনশীলতার প্রবৃত্তি। গরিষ্ঠদের প্রতিনিধিরা দেশ চালান, কিন্তু লঘিষ্ঠরা মতামত দেন, সমালোচনা করেন, প্রয়োজনে প্রতিরোধও করেন। তাঁদের কথা সশ্রদ্ধায় শুনে সুস্থ সরকার তার নীতি ও পথ বদলও করেন।

ফরাসী দার্শনিক ভলতেয়ার একজনকে বলেছিলেন — তিনি তাঁর সঙ্গে কোনও ব্যাপারেই একমত নন, কিন্তু এটা তিনি আমৃত্যু মানবেন যে, ব্যক্তিগত মত প্রকাশের অধিকার তাঁরও (উক্ত ব্যক্তির) আছে। এটাই হল গণতান্ত্রিক জীবনের মূল কথা।

কিন্তু এই নিহত প্রজাতন্ত্রে কি হয়?

আমাদের সাংবিধানিক ব্যবস্থা নাকি বৃটেনের মতো। বৃটেনে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী নেতার সমঝোতার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিল তৈরি হয়, আইনসভার কর্মসূচী রচিত হয় এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে নীতি গৃহীত হয়। স্যার জেনিস্ মন্তব্য করেছেন, 'Mans proposals of the government are not oppose, suceause there is general agrement... the goveremant govenerns under the criticism from the opposition...It is possible, too, to criticize or a proposal without opposing it'— (দ্য কুইক্'স গভর্নমেন্ট, পৃঃ ৮৭-৮৮)।

আর আমাদের এখানে ? কেন্দ্রীয় সরকার একদিনে নামমাত্র আলোচনার পর আটটা বিল পাশ করে, আর রাজ্য সরকার গরিষ্ঠতার দম্ভে হুঙ্কার দেয় — তার পেছনে ২৩৫ জন, বিরোধীদের মাত্র ৩০ জন, সুতরাং যা খুশী করার অধিকার তার আছে। গ্রেন্ভিল অষ্টিন আশঙ্কা করেছিলেন ১৯৬৬ সালের পর গণতান্ত্রিক মানসিকতা নষ্ট হয়ে যাবে — (ইণ্ডিয়ান কন্স্টিটিউশান, পৃ : ৩৩১)। আইন সভায় দু-পক্ষের আচরণেই সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হৈ-চৈ, চিৎকার, ওয়াক আউট, গালিগালাজ, সভাপণ্ড, স্পীকারের 'মেজ' কেড়ে নেওয়া, ওয়েলে নেমে আসা ইত্যাদি প্রায় নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে গেছে। যারা এখানে সহবত শেখাতে চায়, তারাও অন্যত্র তাণ্ডব চালায়। অনেক প্রতিনিধির আচরণই নিন্দনীয় বা 'deplorable' — (ডঃ বি সি রাউত — ডেমোক্র্যাটিক কন্স্টিটিউশান অফ্ ইণ্ডিয়া, পৃ : ১৫৯)।

অনেক ক্ষেত্রেই বিরোধীদের দমন করার ব্যবস্থা নেওয়া হয় স্বৈরাচারী পদ্ধতিতে। ডাঃ সুভাষ কাশ্যপ লিখেছেন, ''Freedom of speech and expression is a simqua non of the functioning of a democratic Polity – (আওয়ার কন্স্টিটিউশান, পৃ : ১০৫)। কিন্তু অনেক রাজ্যে বিশেষত, পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীদের তো, বুদ্ধি জীবীদের প্রতিবাদ সমালোচনাকে বিশ্রী ভঙ্গিতে রুদ্ধ করার চেষ্টা করেছে সরকার। তাঁদের একটা ন্যায্য ও শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ প্রয়াসকে ১৪৪ ধারার মাধ্যমে বারবার ধ্বংস করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র ক্যাডারদের নামানো হয়েছে দরিদ্র মানুষদের দমন করার জন্য। সংবিধানের ১৯ (১) (খ) ধারাতে একটা অধিকার দেওয়া হয়েছে — 'to assemble peacabely and without arms'। কিন্তু বুদ্ধি জীবীদের মিছিলও আটকানো হয়, তাঁদের লালবাজারে নেওয়া হয়। ১৯ (১) (ছ) অনুচ্ছেদ জীবিকা বাছাই-র অধিকার দিয়েছে — অথচ কৃষককে, মালী, দোকানদার চাকর বানানোর জন্য কেড়ে নেওয়া হয়েছে কৃষকের জমি, বাধা দিতে গিয়ে ধর্ষিতা হয়েছেন অসহায় নারীরা। এটা প্রজাতন্ত্র?

প্রজাতন্ত্রের অন্যতম লক্ষণ ন্যায় বা 'justice'। কিন্তু ন্যায় কে পেলেন? রাষ্ট্রপতি কালাম রাজনীতি তে নীতি আনতে চেয়েছিলেন, তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছে। উপরাষ্ট্রপতিকে সাধারণত রাষ্ট্রপতি করা হয় — কিন্তু কেন্দ্রে পালা বদল হওয়ায় তাঁকেও বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রবীণতম বিচারপতিকে টপকে অন্যদের প্রধান বিচারপতি করা হয়েছে। পছন্দমতো রায় না দেওয়ার নীতিনিষ্ঠ বিচারপতিকে বদলী বা গালাগাল দেওয়া হয়েছে। বিবেকবান রাজ্যপালকে বিশ্রী ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে। কোটি কোটি মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে থাকেন — তাঁদের সংসদীয় প্রতিনিধিদের প্রত্যেকের মাসিক আয় ২ লাখ ৬৬ হাজার টাকা। বিধায়কদের আয়ও প্রচুর।

সরকারি হাসপাতালকে অকেজো করে বেসরকারি নার্সিহোম করা হয়, স্কুল-কলেজে অরাজকতা চালিয়ে টিউটোরিয়েলের ব্যবসা হয়, ওষুধে ভেজাল চলে, পরিবেশ নষ্ট করে ও জলাশয় বুজিয়ে প্রমোটিং চালায় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। নারী পাচারের ব্যবসায় ও মদের কারবার চলে অবাধে। জঙ্গি হানায় সাধারণ মানুষ মারা যান, কিন্তু জেড্ ক্যাটাগরির নিরাপত্তা বাড়ে মহা-মহানায়কদের। এবং একটা রাজ্যে সত্তর/আশি হাজার জামিন অযোগ্য ওয়ারেন্ট থানায় জমা থাকে দলীয় লোকদের বাঁচানোর জন্য, কিন্তু বিরোধী দলের লোকদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হয়। হাজতে ধৃতদের মৃত্যু সংখ্যা বেড়ে চলে। সরকারের গাফিলতি ও শিক্ষা ব্যবসায়ীদের ধান্দাবাজীতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভুগতে হয়। তাঁদের অনেকের চাকরি যায়। স্পীকার রামচন্দ্রন মন্তব্য করেছেন, 'Many politicans demand partisan action and civil servants who are straight, honest and self-respecting are becoming a rare pecies'— (পাব্লিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশ্যান ইন ইণ্ডিয়া, পৃ : ১৫১)। আর পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে পুলিশের কাজ সরকারের তোষামোদ ও বিরোধীদের দমন করা। ডঃ বাসুদেব চ্যাটার্জীর ভাষায় —'In some cases, the police caved in to save its skin and, in other cases, to harassed the, people being dictated by the political leaders' — (পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, পৃঃ ৯৫১)।

গণতন্ত্র আবিস্কৃত হয়েছিল বুলেটকে দূর করে ব্যালটের রাজত্ব কায়েম করার জন্য। কিন্তু আমাদের দেশে এখন বুলেটের দ্বারাই ব্যালট মেলে। নির্বাচনে রক্তের বন্যা বয় — জীবিতদের অনেকে ভোট দিতে পারেন না, মৃতরা ভোট দেয়। ডঃ এ সি কাপুরের ভাষায় — 'even dacots are used by the politicians (দ্য ইণ্ডিয়ান পলিটিকগ্যাল সিস্টেম, পৃ : ৪২৫)।

Swastika
26 January - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

‘হুজি’ – এক চরম সন্ত্রাসবাদী সংগঠন

(১৪ পাতার পর)

হুজি এক চরম সন্ত্রাসবাদী সংগঠন

হুজির দাবি অনুসারে সরকার তাদের কাজকর্ম চালাবার অনুমতি দিয়েছে এইজন্য যে, তাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগের প্রমাণ নেই। কিন্তু অক্টোবর ২০০৫ সালে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে সরকার তাদের বে-আইনী ঘোষণা করে। আমেরিকা হুজিকে ইতিমধ্যে বিদেশী সন্ত্রাসবাদী দল হিসেবে ঘোষণা করেছে। এমনকী বাংলাদেশের তদারকি সরকারও এদের কাজকর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ। ২০০৮ সালের প্রথমদিকে বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারের সাহায্য নিয়ে সংগঠনের ধৃত দুই জঙ্গিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। এই দুই জঙ্গি আনিসুল মরসালিন ও মাহিব্বুল মুত্তাদিনের বর্তমান ঠিকানা দিল্লীর তিহার জেল। বাংলাদেশের এই দুইজন ফরিদপুরের লোক এবং গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৬-এ নয়াদিল্লী রেল ষ্টেশনে আর ডি এক্স, পিস্তল এবং বৈদ্যুতিন ডিটোনেটর সমেত ধরা পড়ে। বি এস এফ-বি ডি আরের যৌথ মিটিং বসেছিল মেঘালয়ের এক সীমানায়। এই বৈঠকে (অক্টোবর ১০, ২০০৮-এ) বি ডি আর প্রধান মেজর জেনারেল সাফিল আহমেদ স্বীকার করে নেন যে হুজি বাংলাদেশ-ভারত — উভয় দেশেরই কাছেই বিপজ্জনক।

নিম্ন অসমের ধুবড়ি জেলায় বাসবাড়িতে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮-এ হুজির ৭ জন সদস্য জাঠ রেজিমেন্টের জওয়ানদের হাতে নিহত হয়। এদের এক গোষ্ঠী গৌহাটি যাচ্ছিল অপর এক গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে। এদের প্ল্যান ছিল গৌহাটিতে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটানোর। যদিও হুজির গৌহাটিতে বিস্ফোরণ ঘটানোর প্রচেষ্টাকে বানচাল করা গেল, কিন্তু আগরতলায় এরা সফল হল। সংবাদে প্রকাশ, হুজি আগরতলায় এই বিস্ফোরণ ঘটায় অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্সের সহযোগিতায়। এ টি টি এফের জঙ্গিরা বাংলাদেশের চট্টগ্রামের মোত্রিঘাটে

শেখ হাসিনা

প্রশিক্ষণ পায় বাংলাদেশের মিলিটারির সহায়তায়। এই বিষয়টা প্রকাশ্যে আসে পশ্চিমবঙ্গে ধৃত কামতাপুরী জঙ্গি নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর। পরে ৩০ অক্টোবর অসম জুড়ে ব্যাপক বিস্ফোরণ ঘটে।

অতীতেও আগরতলায় হুজি সক্রিয় ছিল। ত্রিপুরা পুলিশ বলছে যে, ২০০৮ মার্চের পর থেকে আই এস আইয়ের সঙ্গে যুক্ত ছয় জন বাংলাদেশীকে গ্রেপ্তার করেছে তারা। এরপর আরও তিনজন বাংলাদেশীকে আগরতলা বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ধরা হয়। হুজির ধৃত সদস্যের মধ্যে এমন একজন রয়েছে যার নাম মামুন মিঞা ওরফে মাজিদুর রহমান। ত্রিপুরার মানিক সরকার পরিচালিত সরকারে এক মন্ত্রী শাহিদ চৌধুরীর সঙ্গে তার যোগাযোগ রয়েছে। ফলশ্রুতিতে ১৭ এপ্রিল, ২০০৮ সালে ওই মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়।

হুজি সদস্যদের ভারত-বাংলাদেশ থেকে নিয়মিত ধরা হচ্ছে। ১৪ অক্টোবর ২০০৮ সালে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন বা ‘র‍্যাব’-এর জালে ধরা পড়ে চার হুজি জঙ্গি সেদেশের খলিশপুর এলাকায়। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় এদেরই একজন ২০০৩ সালে ইসলামি সংগঠনে যোগ দেয় এবং চট্টগ্রামের কোডালা জঙ্গলে প্রশিক্ষণ নেয়। ২০০৪ সালে চট্টগ্রামে ধরা পড়লেও সে জামিন পেয়ে ফের অন্তরালে চলে যায়। এইসব জঙ্গিরা ‘র‍্যাব’-কে জিজ্ঞাসাবাদের সময় জানায় যে এরা মুফতি আব্দুল হান্নানকে পুলিশ হেফাজত থেকে ছাড়িয়ে নেবার মতলবে ছিল।

হুজি জঙ্গিরা সন্ত্রাস সৃষ্টির কাজে লিপ্ত নয় এমন বলাটা সত্যের অপলাপ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এইসব দলগুলির প্রতি সহমর্মিতা তদারকি সরকারের নরম নীতিকেই প্রতিষ্ঠা করে। এসব দেখে কি মনে হয় না যে, তদারকি সরকার দেশের মূলধারার দুই রাজনৈতিক শক্তিকে খর্ব করতেই হুজির মতো ভয়ানক এক ইসলামি জঙ্গি সংগঠনকে জনসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালাচ্ছিল?

দেশের নবম সংসদীয় নির্বাচনের ঠিক প্রাক্কালে এক জাতীয় কনভেনশনের মাধ্যমে হুজির নতুন খোলসরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে আই ডি পি। আজিজুল হক বলেছেন, “আমরা সরকারি ফরমে বর্ণিত সবরকম শর্ত পূরণ করে রেজিস্ট্রেশনের চেষ্টা চালাচ্ছি। সেইসঙ্গে সাংগঠনিক কাঠামো গড়তে জেলা এবং উপ-জেলা স্তর পর্যন্ত গঠনের চেষ্টা করছি।” এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে আগামীদিনে দেশের রাজনীতিতে আরও সক্রিয় হতে চায় হুজি।

এসব দেখে মনে হয় তদারকি সরকার দেশকে অন্য দিশায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল যেখানে কেবল জঙ্গি গোষ্ঠীই শক্তিশালী হবে। এই তদারকি সরকার ছিল কার্যত বি এন পি-জামাতেরই পরিবর্তিত স্বরূপ। এই সরকার বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে কোনও পরিবর্তন আনতে পারেনি। শেখ হাসিনা সরকার ‘হুজি’-কে কিভাবে মোকাবিলা করে, এখন সেটাই দেখার।

নাগপুরে স্মৃতি মন্দির পরিসর নির্মাণে নব-রচনা প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা তথা আদ্য সরসঙ্ঘচালক পরমপূজ্য ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার-এর প্রেরণাদায়ী স্মৃতি মন্দির এবং দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক পরম পূজনীয় শ্রীগুরুজীর (মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর) ত্যাগ ও সমর্পণের প্রেরণাদায়ী ‘স্মৃতি চিহ্ন’ আজ হিন্দু সমাজের শ্রদ্ধাকেন্দ্র স্বরূপ। এই স্মৃতিভবন পরিসরে রাষ্ট্রোত্থান ও চরিত্র নির্মাণের বিভিন্ন প্রচেষ্টা সারা বছর ধরেই হয়ে থাকে। ইতিমধ্যেই এই স্মৃতি মন্দির পরিসরে সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক তথা অখিল ভারতীয় ব্যবস্থা প্রমুখ পাণ্ডুরঙ্গ ক্ষীরসাগরের স্মৃতিতে ‘পাণ্ডুরঙ্গ ভবন’, প্রাক্তন সরকার্যবাহ স্বর্গীয় মাধবরাও মূল-এর স্মৃতিতে ‘মাধব ভবন’ ও প্রাক্তন সহসরকার্যবাহ স্বর্গীয় যাদবরাও যোশী-র স্মৃতিতে ‘যাদব ভবন’ নির্মিত হয়েছে।

সম্প্রতি এই পরিসরে ‘স্মৃতি মন্দির’-এর পূর্ণ ব্যবস্থা, নতুন ও বিশাল ‘মহর্ষি ব্যাস সভাগৃহ’ এবং সেইসঙ্গে সৌরশক্তি, জল সংরক্ষণ, প্রদর্শনী কক্ষ, গ্রন্থাগার, সঙ্ঘসাহিত্য বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

এই ‘নবরচনা প্রকল্প’-এর সাফল্যের জন্য ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতি (নাগপুর)-এর অধ্যক্ষ তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রী কে এস সুদর্শন এক আবেদনে সকলকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, **‘Dr Hedgewar Smarak Samiti, Nagpur** — এই নামে চেক অথবা ড্রাফট পাঠানো যেতে পারে, যা আয় করের ‘৮০-জি’ ধারার সুবিধাযুক্ত।

দূর হটো সন্ত্রাস!!! শিবাশিস্ দত্ত

দুমদাম্ ফাটে বোমা
জানি বুঝি পটকা
দাউ-দাউ আগুনেতে
লাগে মনে খটকা!
হাউ-মাউ কান্নায়
ভাব যায় চটকে
উড়ে যায় মুণ্ডুটা
পড়ে দেহ লটকে!
দুদ্দাড় ছোটাছুটি
ভাঙ্গে সব ঝটকায়
‘ওরা কারা’ মানুষের
পিণ্ডিটা চটকায়!
‘ওরা কারা’ মানুষের
পিণ্ডিটা চটকায়!!

পাঁচতারা রেস্তোঁরা
তাও নেই নিস্তার
জঙ্গির সঙ্গীরা
করে জাল বিস্তার!
এলোমেলো গোলা-গুলি
দেয় ওরা ছুটিয়ে,
কত তাজা তাজা প্রাণ
পড়ে হায় লুটিয়ে!
মন্ত্রীরা ভ্যাবাচ্যাকা
সান্ত্রীরা মরছে,
দেশ জুড়ে ‘সন্ত্রাস’
সব নাশ করছে!
দেশ জুড়ে ‘সন্ত্রাস’
সব নাশ করছে!!

ওঠো ওঠো জনগণ
ছাড়ো সুখশয্যা
চারদিকে হাহাকার
এতো ভারি লজ্জা!
গর্জিয়ে ওঠো সব
থেকো না তো চুপ্ তো
জাগবেই মানবতা
মৈত্রীর রূপ তো!
জাগবেই মানবতা
মৈত্রীর রূপ তো!!

তেতে ওঠো লিখিয়েরা
মেতে ওঠো আঁকিয়ে
গাইয়ে ও বাজিয়েরা
থেকো না তো তাকিয়ে,
জাগো ওঠো পড়ুয়ারা
জাগো মত মরোয়া
নেই ভয়-সংশয়
মৃত্যুর পরোয়া!

নয় যে সময় আজ
সান্ত্বনা ভিক্ষার
‘দূর হটো সন্ত্রাস’
দাও এই ধিক্কার!
‘দূর হটো সন্ত্রাস’
দাও এই ধিক্কার!!

দেশজুড়ে আবছার
বন্দুকবাজরা
সংহতি-প্রগতির
দেহ করে ঝাঁঝরা!
দিল্লি বা মুম্বাই
অসম বা বাংলায়
রোজ মরে কত লোক
জঙ্গির হামলায়!
কারা দেয় উস্কানি
এইসব কার্যে?
অজানা নেই তো আজ
তথ্যটা আর যে,
হোক নেতা কেডিকেটা
এম পি বা মন্ত্রী,
মুখোশ খুলতে হবে
যত ষড়যন্ত্রীর!
মুখোশ খুলতে হবে
যত ষড়যন্ত্রীর!!

সীমান্তে কেন রোজ
রক্ষীরা মরছে?
ফাঁকতালে এতো লোক
কেন ঢুকে পড়ছে?
এই নিয়ে মাথাব্যথা
নেই কেন তোমাদের?
কারা সেই বে-ইমান
এদেশের গদ্দার?
গদির স্বার্থে দেয়
ন্যায়নীতি বিকিয়ে,
জঙ্গির আস্তানা
রাখে সব টিকিয়ে!
ধ্বংসের বীজ বোনে
নিজ হীন স্বার্থে
বিছুতেই দেবো না তো
ওদেরকে বাড়তে,
তাই আজ প্রয়োজন
মোক্ষম শিক্ষার –
‘দূর হটো সন্ত্রাস’
দাও এই ধিক্কার!
‘দূর হটো সন্ত্রাস’
দাও এই ধিক্কার!!

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com